

૧મ  
અંક

# મૂઠા ઉત્તા લોહ

હાલતામામ્રય જીવત

## মুঠো ভরা রোদ

১ম সংখ্যা

প্রকাশকাল

১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সুদীপ্ত কর

সহযোগিতায়

রিয়েল ডেমোন

মাহমুদা সোনিয়া

মেঘের দেশ

শশী হিমু

সত্ত্ব

লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

ব্যবহৃত ছবি ইন্টারনেট থেকে নেয়া

যে কোন লেখা লেখকের অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ নিষেধ

মুঠো ভরা রোদ



# ই বুক-‘মুঠো ভরা রোদ’

## আমাদের কিছু কথা

ভালোবাসার দিনটিকে রাঙিয়ে তুলতে আমরা ব্লগার বন্ধুদের কাছে ভালোবাসার গল্প, কার্টুন, স্মৃতিকথা, কবিতা, সায়েন্স ফিকশন, স্যাটেয়ার, মজার কোন অভিজ্ঞতা সহ ভালবাসা নিয়ে মতামত অথবা প্রবন্ধ আহ্বান কবি আমাদের কাছে, করেছিলাম। আমরা কৃতজ্ঞ যে অসংখ্য লেখক তাঁদের সুন্দর কিছু লেখা পাঠিয়েছেন।

খুব কম সময়ের ভেতর আমরা শত ব্যস্ততা ফেলে সুন্দর একটা ই বুক- আপনাদের উপহার দিতে চেয়েছি। কতোটুকু সফল হয়েছি তা পাঠক বলবেন তবে আমরা অন্তত বলবো সময় স্বল্পতার জন্য খুব সুন্দর উপস্থাপন হয়তো করতে পারিনি। কিছু ভুল ত্রুটি থেকেই গেছে আমাদের অজান্তেই, সব বিষয় পাঠক লেখক ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘোষণা দিচ্ছি আগামী বৈশাখে ‘মুঠো ভরা’ এর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হবে। বৈশাখ সংখ্যা হয়ে উঠবে ‘রোদ - আপনাদের বর্ণিল লেখনী এবং অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত অনন্য একটা ই বুক। আমাদের সাথেই থাকবেন আশা করি।

অসংখ্য লেখা থেকে মানসসম্মত লেখা বাছাইয়ের জন্য আমাদের বিচারক টিমে ছিলেন সামহোয়ার ইন ব্লগের চারজন জনপ্রিয় ব্লগার রিয়েল ডেমোন, মাহমুদা সোনিয়া আপু, মেঘের দেশে এবং শশী হিমু। ই-বুকের সুন্দর একটা নাম দেয়া জন্য ব্লগার ত্রাতুল ভাইকে ধন্যবাদ জানাই। ভালবাসা দিবস সংখ্যায় ঠাই পাওয়া লেখকসহ যারা এবার লেখা জমা দিতে পাড়েন নাই তাঁরাও বৈশাখ সংখ্যার জন্য লেখা পাঠাবেন।

মুঠো ভরা রোদ

বসন্ত এবং ভালবাসা দিবস পাশাপাশি বসে থেকে আমাদের মনে  
ভালোবাসার রঙ মাখিয়ে দিক আজীবন এই প্রত্যাশা রইলো সবার প্রতি।  
আমাদের স্লোগান ছিল বন্ধুরা চলুন আমরা , ভালবাসাময় জীবন। হ্যাঁ -  
একটা সমাজ গড়ি হিংসা বিদ্বেষ ভুলে যেখানে শুধু ভালবাসা থাকবে।  
থাকবে না কোন সংঘাত। সেখানে পলাশ শিমুলের ডালে বসে কোকিল  
তার সুর লহরী ছড়িয়ে দিবে বিস্তৃত প্রান্তরে। শহুরে জীবনে আমরা গ্রামীণ  
আবেশে সবুজ ঘ্রাণে বুক ভরে শ্বাস নিবো। ভালবাসবো মানুষকে।  
ভালবাসবো সৃষ্টিকে।

কৃষ্ণ কুমার গুপ্ত  
সুদীপ্ত কর

সম্পাদকদ্বয়, ই-বুক 'মুঠো ভরা রোদ'  
১৪ ফেব্রুয়ারি , ২০১২

মুঠো ভরা রোদ



# সূচীপত্র

## কবিতা

মুঠো ভরা রোদ	সুদীপ্ত কর
ভ্রমণবিষয়ক	চাণক্য বাঁড়ে
মেঘমন	গ্যাব্রিয়েল সুমন
তিনটি কবিতা	দ্রাতুল অরণ্য
ভালোবাসা অনুকাব্য...	আশিকুর রহমান অমিত
তিনটি কবিতা	আশরাফুল ইসলাম দুর্জয়
দুটি কবিতা	কবীর হুমায়ুন
ভালোবাসার অন্বেষণ	নীল কষ্ট
দুটি কবিতা	কবিশহিদুল
হঠাৎ দেখা	তাসনুভা আখতার রিয়া
প্যারিসের চিঠি	রিয়েল ডেমোন
দুটি কবিতা	বর্ণচোরা
বলে যাও ভালবাসি	রেজওয়ান তানিম
মেয়ে	মহাবিশ্ব
দুটি কবিতা	শাহেদ খান
তোমার জন্য ভাবনাগুলো মাঝে মাঝে	
কবিতা হয়ে যায়	নিশাচর ভবঘুরে।
শিরোনামহীন	দূরদ্বীপবাসিনী

মুঠো ভরা রোদ

## গল্প

আয়নিত ভালবাসা  
ভালবাসার বৃষ্টি  
তানিয়া ম্যাডাম  
দ্বিধা

সময়ে বদলে যাওয়া  
আমিতার জন্য ভালবাসা  
পাগলামী নয়, ভালোবাসা!

একটি পোড়া বাড়ি এবং আমরা  
ক'জন

সত্যি বলছি, তোকে খুব ভালোবাসি...

তুমি আমায় বেঁধেছো বৃত্তের পরিধিতে

দুঃস্বপ্নের মৃত্যু

তপু আর তিতির.....নিতান্তই দুই

অবুঝ কিশোর কিশোরী

কল্পলোকের কল্পকথা

বালিশ

অর্ণব আর আমি

রোদের পরে মেঘ কেঁদেছে ইচ্ছে

তোমায় ছুটি

পুল ক্লাব

নিশাত রহমান

মেঘেরদেশ

কয়েস সামী

শূণ্য উপত্যকা

মেঘের দেশে

নিশাচর ভবঘুরে।

স্বপ্নকথন

~মাইনাচ~

দুরন্ত জেসি

অচিন রূপকথা

কি নাম দিব

নাহিন আজিম

Imran Taher

মাহমুদা সোনিয়া

ত্রিনিদ্রি

রিয়েল ডেমোন

সুদীপ্ত কর

মুঠো ডরা বোদ



## স্যাটেয়ার, রম্য এবং মুক্ত গদ্য

বেঙ্গমা বেঙ্গমী এবং ব্যাণ্ডার্জমের গল্প

হাসান মাহবুব

ঠাটা টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি

জুয়েল দেব

কেমন আছো?

রাজিব চৌধুরী

বৃষ্টি পরবর্তী নিমগ্নতা

নীরব ০০৭

মুঠো ডরা বোদ

## মুঠো ভরা রোদ

কল্লশ্বরের অন্ধ আলোয় ধুলিস্যাৎ পদচারণায়  
মুখর তুই আজ

বলেছিলাম তোকে কাদবোনা আমি  
কান্না কি আমায় মানায় আজ  
অনেক শান্তি আজ তোর অন্তরমহলে  
সে আজ বড় সুখের সময়  
জানি তুই সুখী হবে অনেক, আমি জানি।

মনে আছে তোর, বলেছিলাম তোকে  
আকাশের যত নক্ষত্র আছে  
আজ থেকে সব তোর  
তুই কিছু বলিসনি তখন, হেসেছিলি শুধু  
আলতো স্পর্শে ভুলিয়ে দিয়েছিলি  
সব দুঃখ, সব কষ্ট, সব যাতনা, সব  
জানি তুই বুঝবি আমায়  
ক্ষমা করে দিবি সব অপরাধ

তুই কি জানতিস ক্ষমার অযোগ্য আমি  
জানতিস আমার কালো সত্ত্বাটা?  
হাজার বছর বয়ে যাব আমি এই অক্ষমতা  
বড় অচল আমি, বড় দুর্বল, বড় পাপী

কথা দিয়েছিলাম এনে দেবো তোকে  
মাঝরাতের জলজোছনা  
শ্রাবণের কালো আকাশে ছড়াবো সাতরঙা মেঘ।  
ভীত হরিণীর চোখ দুটো তোর  
মানেনি সে কথা, করেছিলো অবিশ্বাস।  
কথা দিয়েছি, কথা কেড়েছি

মুঠো ভরা রোদ



রাখিনি কোন প্রতিশ্রুতি  
অলস মুখে বিমূর্ত শব্দচারণ আর স্বপ্নযাপনই তো আমার জীবন

তুই দেখেছিলি খোলা আকাশে মুক্ত পাখি হয়ে উড়ে বেড়ানোর স্বপ্ন  
বলেছিলাম আমি আলো এনে দেবো,  
সরবো মেঘের ঘনঘটা, বন্ধ করবো মেঘের মুখ।  
জানি আমি তুই অপেক্ষায় ছিলি  
কবে আমি ফিরি  
পথ চেয়ে ছিলি।।  
চাদরের নীচ থেকে মুচকি হেসে বের করবো রোদের ঝুলি  
ছড়িয়ে দেবো আকাশে,  
তোর মুখের হাসির রেখা মিলিয়ে যাবার আগেই।  
আকাশ ভেসে যাবে আলোর বন্যায়,  
সার্থক আমি তাকিয়ে দেখবো  
মেঘের সাথে হৃদয়ের পরশমণির উচ্ছৃঙ্খল ডানা ঝাপটানো।

কথা রাখিনি,  
তাই বলে কেন এত অভিমান তোর?  
রাগ কর তুই বাধা দেবোনা  
কথা না বল বকবোনা আমি।  
একবার শুধু মেলে ধর চোখ দুটো তোর  
একবার দেখ এই অভাগারে,  
অনেক আদরে জমিয়ে রেখেছি  
ছেড়া চাদরের ভেতরে লুকোনো  
তেজ হারানো, ছায়াশীতল  
মুঠো ভরা রোদ...

সুদীপ্ত কর

ই-মেইল : cryptexcode@gmail.com

মুঠো ভরা রোদ

## ভ্রমণবিষয়ক

হেঁটে হেঁটে যার কাছে আসি  
সে ভ্রমণ-বিরোধী

জলজ নই বলে শিখিনি সাঁতার  
তবু সে ব্যক্ত করে  
সপ্ত সমুদ্রের প্রতিশ্রুতি-

অভ্যস্ত অন্ধকারে রোজ  
সে শুধু উন্মুক্ত করে অপার আকাশ  
অথচ আমার নেই পাখিবিক ডানা!

বিহারে বেরিয়েও তাই থির হয়ে আছে  
ভ্রমণ-আকাজক্ষী দুটি পা...

চাণক্য বাড়ি

ই-মেইলঃ [chanakyabarai@yahoo.com](mailto:chanakyabarai@yahoo.com)

মুঠো ডরা বোদ



## মেঘমন

দূরে থাকা মেঘ তুই দূরে দূরে থাক।  
-রাহুল আনন্দ

আকাশ দিয়ে মেঘ উড়ে যায়  
তুমি গান গাও, ডাকো, মেঘকে আকোঁ;  
মেঘও পাঠাবে বার্তা।

মেঘকে গভীরভাবে ভালবাসো,  
মেঘ বৃষ্টি হয়ে নামলেও নামতে পারে,  
বেসুরো বিমানবালার হাতছানি সে শুনবে না।

মেঘকে গালি দাও,  
সে হয়তো তোমার বাড়ির ছাদের আকাশ দিয়ে নাও উড়তে পারে;  
কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে ফরমালিন মেশাবে না।

মেঘকে উদ্দেশ্য করে তীর ছোঁড়ো;  
বাতাসের আশ্রয়ে নীলের জমিনে সাদা আর কালোর মাঝামাঝিতে  
মেঘ তবুও মেঘ,  
বানভাসি জলের উদ্বেগ।

গ্যাব্রিয়েল সুমন

ই-মেইলঃ gabrielsumon@gmail.com

মুঠো ডরা বোদ

## নীলনয়না

নীলনয়না দৃষ্টিনীলে  
মুগ্ধসময় অন্তবিহীন  
এইতো সেদিন;  
শূন্য এখন চোখের কোণে  
রঙবিনাশী, তোর কি তাতে?  
সুখেই আছিস!

জোৎস্নাপ্রহর একাই কাটে  
গল্পবিহীন, তুই কাছে নেই  
থাকবি কেন?  
তুই যে বিলীন আকাশতারায়  
মেঘনটবর তাড়িয়ে বেড়াস  
ভুলেই গেছিস!

বারান্দাভোর ঝুলচেয়ারে  
একলাবিষাদ তোকেই ভাবি  
তুই কি বুঝিস?  
দৃষ্টিগহীন দূরপলাতক  
তোকেই খোঁজে শূন্যব্রজে  
তুই কি জানিস?

ডাইরিপাতায় তোর ছোঁয়াটা  
শব্দপ্রবণ হাতের চুড়ি  
রেখেই গেছিস;

হাঁটতে পথে লীনখেয়ালে  
লেকের ধারে শেষ বিকেলে  
আমায় খুঁজিস?

কফির ফিউম একাই দেখি  
উলটো চেয়ার ফাঁকাই থাকে  
জিতেই গেছিস;  
আলতো দূরে হাতের ছোঁয়া  
নাইবা পেলাম, কি এসে যায়!  
স্নিগ্ধ থাকিস।

পথ হারিয়ে পথেই ঘুরি  
পথের শিশুর মুখসরলে  
তোকেই খুঁজি;  
প্রশ্নচোখে হাঁটছি আজও  
কোন অভিমান? কেনই গেলি?  
কি ভেবেছিস?

খেয়ালী তুই ঝুম বরষায়  
হাত বাড়িয়ে তোর জানালায়  
দাঁড়িয়ে থাকিস?  
অশ্রুচোঁয়া বৃষ্টিফোটার  
তোকেই দেখি;  
তাই বলে কি পড়ছে মনে!

মুঠো ডরা বোদ



একটুও না,  
ভুল ভেবেছিস।  
সুদূরদেশে হারিয়েই যেতাম  
বুক পকেটের নিচেই দেখি  
তোর কবিতা;  
তোর কবরে ফুল ফুটেছে  
একটু পাশে বসতে দিবি?  
কাঁদবো আমি? তাই দিবি না?  
কাঁদবো না আর, দেখিসরে তুই!

অশ্রু চোখে? ও কিছু না।  
কি যে হল চোখ দু'টোতে!  
যখন তখন ঝাপসা হবে।  
কাঁদবো কেন? তুই কে আমার?  
রাখবো মনে? বয়েই গেছে!  
তুই রেখেছিস?

## শব্দ পরস্পর

এসো শব্দে বাঁধি ঘর  
শব্দ পরস্পর,  
চোখে মেঘলা মনোহর  
বর্ষা ঝরঝর।

এসো ছন্দে তুলি ঝড়  
ছন্দ মর্মর,  
কথা কর্ষে কারিগর  
সুপ্ত উর্বর।

এসো বন্ধু কবিতায়  
বন্ধু উপমায়,  
ভেঙ্গেচূরে অসহায়  
দীর্ঘ দোটানায়।

এসো শুদ্ধ করি মন  
শুদ্ধ যৌবন,  
হাতে হাত রেখে পণ  
দৃপ্ত অগণন।

এসো জ্যোৎস্না করি পান  
জ্যোৎস্না অফুরান,  
ঠোঁটে সিক্ত অভিমান  
রিক্ত আহবান।

এসো কাব্যসুধা শুষি  
কাব্য বারোমাসি,  
ঝরে নির্ঝরা হাসি  
তৃপ্ত উল্লাসী।

মুঠো ডরা বোদ

এসো মুক্ত করি ভার  
মুক্ত পারাপার,  
ধ্বনি নৃত্যে চরাচর  
জোনাক আঁধার।

এসো স্নিগ্ধ অভিলাসে  
স্নিগ্ধ অবকাশে,  
আজ একটু বস পাশে  
মৌনী ভালবেসে।।

## পৌনঃপুনিক ভাঙছি শুধু

আমার এখন রিক্ত যাপন  
শূন্য রাতে ধূসর স্মৃতি,  
আমার কথা কেউ রাখেনা  
চোখ মেলেনা তিতলী  
কাঁপন;  
মৌন এখন অঝর শ্রাবণ  
তপ্ত বুকে চৈত্র পুষি,  
আমার শোকে কেউ কাঁদেনা  
আর জমেনা অশ্রু প্লাবন।

আমার এখন শব্দগ্রহণ  
শব্দপ্রহর মৌন আঁধার,  
আমার কথা কেউ ভাবেনা  
আমি এখন অচ্ছূত জন;

ভিন্ন গাঁয়ে ঝরছে গহন  
শব্দধোয়া বর্ষা মাদল  
কাব্যখরা আর কাটেনা  
আমায় পোড়ে নিত্য দহন।

আমার এখন কষ্ট আপন  
রুগ্নপ্রহর চাইছে ছুটি,  
আমার পাশে কেউ বসেনা  
কেউ আঁকেনা সান্দ্র স্বপন;  
রুদ্ধ প্রাণে ভয়াল ভাঙ্গন  
পৌনঃপুনিক ভাঙছি শুধু,  
আমার বীণা সুর তোলেনা  
নীরব দহন করছি বহন।।

দ্রাতুল অরণ্য

ই-মেইলঃ [tratulx@gmail.com](mailto:tratulx@gmail.com)

মুঠো ডরা বোদ



## ঠাটা টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি

আরেকটা গাল পেতে দেব কিনা ভাবছি। কোনো এক মনীষি নাকি বলেছেন, একগালে থাপ্পড় দিলে আরেক গাল পেতে দিতে হয়। কিন্তু মনীষির বাচ্চা মনে হয় এত কঠিন থাপ্পড় কোনদিন খায় নাই। খেলে আরেক গাল পেতে দেওয়ার চিন্তা মাথায় আসত না, মালকোচা মেয়ে দৌড় দেওয়ার কথা চিন্তা করত। শিরীষ খাতুনের হাতে সম্ভবত জাদু আছে। এক থাপ্পড়ে আমার মগজ সেভেন আপ হয়ে গেছে। কান দিয়ে লিক করবে কিনা কে জানে! না, আরেক গাল পেতে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। আমি ‘তেলাপোকা, তেলাপোকা’ বলে চিৎকার দিয়ে উঠলাম। অমনি ম্যাজিক, শিরীষ খাতুন নাচতে শুরু করলো। আমি এই ফাঁকে ঝেঁরে দৌড়।

বাসায় এসে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। বাপরে বাপ, গালটার উপর দিয়ে ছোটখাটো একটা সিডর আঘাত হানার মত অবস্থা। মনীষির কথামতো আরেকটা গাল পেতে দিয়ে আরেকটা থাপ্পড় খেলে নির্ঘাত ডায়াবেটিস হয়ে যেত। আমার আবার ডায়াবেটিস হলে একটুও ভালো লাগে না। ও আচ্ছা, কী জন্য শিরীষ খাতুনের থাপ্পড় খেয়েছি সেটা তো বলা হয় নি। শিরীষ খাতুনের সাথে যে আমি প্রেম করতে চাই, সেটাতো আর সরাসরি গিয়ে বলা যাবে না। ওর গলার স্বর মাশালাহ খুবই ভালো। বললেই ওর হেভি মেটাল গলা দিয়ে এমন চিৎকার জুড়ে দেবে সে, মনে হবে পাড়ায় কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ড কনসার্ট করতে এসেছে। তাই একটা বুদ্ধি বের করেছিলাম। শিরীষ খাতুনকে গিয়ে বলেছিলাম, ‘শোনো, তোমার ভাই কয়েকদিন আগে আমাকে বলেছে, ওকে নাকি কেউ মামা ডাকে না। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ওকে আমার ছেলের মামা বানাবো। তুমি কি বল?’ আর তাতেই এই অবস্থা। কিন্তু আমিও ছাড়ার পাত্র নই। আমার নাম আক্কেল আলী। আক্কেল আলীদের আক্কেল প্রায় নেই বললেই চলে।

শিরীষ খাতুনের বাসার আশে-পাশে ঘোরা শুরু করলাম। কয়েকদিন ঘোরার পর একদিন শিরীষ খাতুনের ডাক পেলাম, ‘আক্কেল ভাই, একটু এদিকে আসেন তো, আপনার সাথে কথা আছে।’

মুঠো ডরা বোদ

আমি তো খুশীতে পাকু পাকু। যাক তাহলে প্রেমে পড়েছে।

শিরীষ খাতুন বলতে লাগলো, ‘আপনি প্লিজ আমার বাসার সামনে ঘুরবেন না, আপনার চেহারা দেখলে আমার কুফা লাগে।’

আমি মরিয়া, ‘কিন্তু আমি যে তোমায় ভালোবাসি।’

‘আচ্ছা বুঝতে পারছি আপনি আমাকে ভালোবাসেন, ঠিক আছে আপনার সাথে প্রেম করতে পারি, তবে একটা শর্ত আছে।’

‘কী শর্ত, আমি যে কোনো শর্তে রাজী।’

‘আমার উনপঞ্চাশ জন বান্ধবী সহ আমাকে চায়নিজ খাওয়াতে হবে।’

আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম, ‘চায়নিজ, জাপানিজ, ভিয়েতনামিজ সব ব্যাটাকে কেটে-কুটে রান্না করে তোমাদের এনে খাওয়াবো।’

শিরীষ খাতুনের উনপঞ্চাশজন বান্ধবীসহ চায়নিজে এসেছি। শিরীষ খাতুন খুব রোমান্টিক সুরে বলতে লাগলো, ‘আক্কেল ভাই, আজকে আপনি চিড়িয়াখানায় কী জন্য গিয়েছিলেন?’

আমি তো অবাক, ‘জন্মের পর থেকে আমি কোনোদিন চিড়িয়াখানায় যাই নি, আগের জন্মে গেছি কিনা কে জানে। তোমার হঠাৎ এই কথা মনে হল ক্যানো?’

‘না, আজকে বান্দরের খাঁচায় একটা বান্দরকে দেখে আপনার মত লাগলো তো!’

কী এত বড় কথা, আমার চেহারা বান্দরের মত! আমি রাগ করে বাসায় চলে আসলাম।

বাসায় এসে অতি মনোযোগের সাথে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। অনেকক্ষণ দেখার পর মনে হল, বাহ আমার বদনটা তো খারাপ না। উত্তর-দক্ষিণ কোণ থেকে দেখলে অনেকটা সালমান খানের মত লাগে। এই খুশীর খবরটা শিরীষ খাতুনকে জানাতে হবে।

শিরীষ খাতুন ফোন ধরতেই চেষ্টা করে উঠলাম, ‘শোনো, কোনাকুনি থেকে দেখলে আমাকে...’

মুঠো ডরা বোদ



শিরীষ খাতুন আমাকে কথা বলতে দিল না, ‘কোনাকুনি থেকে দেখতে হবে না, সামনাসামনি এসে দেখে যাবেন।’

আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না, ‘সামনাসামনি দেখবো মানে?’

শিরীষ খাতুন বলতে লাগলো, ‘সামনের শুক্রবার আমার বিয়ে, আমার প্রেমিক আমাকে বলেছে ওকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে না করতে। তাই বলছিলাম কি, বিয়ের সময় আমাকে সামনাসামনি এসে দেখে যাবেন। আর কিছু মাছ-মাংস খেয়ে যাবেন। ভাত খাওয়াতে পারবো না, চালের যা দাম।’

কী এত বড় ফাজলামি। আমি রাগে নাচতে লাগলাম। আমার সাথে প্রেম করার নামে এত বড় ঠাট্টা করার সাহস তোমাকে কে দিয়েছে। আমি বুশের ইরাক মিশনের মত তোমার বাড়িতে সৈন্য পাঠাবো।

**জুয়েল দেব**

আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ই-মেইলঃ [Jeweldeb.cu@gmail.com](mailto:Jeweldeb.cu@gmail.com)

মুঠো ডরা বোদ

## ভালোবাসা অনুকাব্য...

ছোটবেলা থেকে তোমায় আমি

কত ভালবাসি

মুখ ফুটে বলতে গেলে

আসে শুধু কাশি।

তোমার কথা মাথায় আসলে

হয়না কোন পড়া

উকি মেরে দেখতে তোমায়

সেদিন খেলাম ধরা।

তোমার জন্য গোলাপ কিনতে

ফুটল হাতে কাঁটা

দিতে গেলে তোমায়

দেখালে আমায় ঝাঁটা।

ভ্যালেন্টাইন ডে তে আমি

আটকে রেখে কাশি

চিৎকার করে বলব

তোমায় ভালবাসি।

আশিকুর রহমান অমিত

ই-মেইলঃ [amit44495@gmail.com](mailto:amit44495@gmail.com)

মুঠো ডরা বোদ



## আয়নিত ভালবাসা

মাঝরাতে ঝিকঝিক ঝিকঝিক ট্রেনের শব্দে তন্দ্রা ছুটে যায় তন্দ্রার ।  
অয়নের পাঠানো শেষ মেইলটার কথা মনে পড়ে , এমনই ট্রেনের  
কথাইতো লিখেছিল ও । তখনই প্রায় ছুটে গিয়ে ল্যাপটপটা নিয়ে এসে  
ওয়ার্ডে সেভ করে রাখা অয়নের মেইলটা পড়তে শুরু করে ও ।

" জানিস তন্দ্রা , ঐদিন খুব মনে পড়ছিল , যেদিন তুই আমি একসাথে  
জয়দেবপুর গিয়েছিলাম ট্রেনে । হুইসেলের শব্দে তুই বেরকম আঁতকে ওঠে  
বারবার আমার কাছে চলে আসছিলি , তখন তোকে আসলেই বুঝে মনে  
হচ্ছিল। জানিস এখানকার ট্রেনগুলো নাদেশের ট্রেনের মত ওত হুইসেল  
দেয় না, মনে হয় কেউ যেন অনেক কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারে না ,  
এমন একটা অবস্থা!"

বছর দুয়েক আগের কথা , তন্দ্রা তখন সবে ভার্চুয়ালি ভর্তি হয়েছে । বেশ  
লাজুক প্রকৃতির বলে ও সহজেই কারও সাথে মিশতে পারত না । কিন্তু  
তারপরেও অন্তরা, মনির আর দিবার সাথে কি করে যেন ওর বন্ধুত্ব হয়ে  
যায়। একদিন ওদেরই আড্ডায় কোথাথেকে এক উদ্ভাস্ত ছেলে এসে হুট  
করে বসে পড়ল। মনিরই পরিচয় করিয়ে দিল,

"তন্দ্রা, ও হচ্ছে অয়ন । আমাদের সিনিয়র যদিও তবে অনেক ফ্রেন্ডলি ।  
এবার অনার্স দেবে। "

:হ্যালো,...আচ্ছা তুমি কি অনেক কম কথা বল?

:না তেমন না।

মুখে বললেও তন্দ্রা আসলে যারপরনাই বিরক্ত হয়েছিল ।

এরপর থেকে ওদের আড্ডায় প্রায়ই অয়নের আগমন ঘটতে থাকে ।  
একথা সেকথার মাঝে অয়ন একদিন তন্দ্রাকে কিছু কথা বলে ,

মুঠো ডরা বোদ

'তন্দ্রা লেগেছিল এ দু'আখিতে,

তন্দ্রা এসেই বলে গেল আমি রয়েছি কি ফাঁকিতে!'

খুব রেগে গিয়েছিল সেদিন তন্দ্রা এটা শোনার পর । ওঠে চলে গিয়েছিল  
আসর ছেড়ে। অয়ন অবশ্য সেদিন ওর রাগ ভাঙাতে গিয়েছিল, কিন্তু খুবই  
যে অভিমাত্রী তন্দ্রা!

:জানিসতো অয়ন ভাইয়া কটা প্রেম করেছে এই ভার্শিটি লাইফে?

:মানে!

:না মানে একটু বুঝে শুনে চল আরকি।

:কি বলতে চাস মুনির?

:যেভাবে ওদিন চলে আসলি তাতেতো বোঝাই যাচ্ছিল যা বোঝার । আর  
তাছাড়া অয়ন ভাইয়া এমনই যে ওর প্রতি মেয়েরা এমনই একটু উইক।

:তুই কি আমাকে আর সব মেয়ের মত মনে করিস?

:ফ্রেন্ড হিসেবে আমার তোকে যা বলার দরকার ছিল , তাই বললাম। আর কিছু  
না।

অয়নকে নিয়ে মুনিরের এমন কথা কেন জানি ভাল লাগছিল না  
তন্দ্রার। বাসায় এসে এটা নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করে ও । সেদিনও যখন  
ও অয়নকে একটা মেয়ের সাথে দেখেছে তখনও ওর রাগ হয়েছে অনেক ।  
কিন্তু কেন?

একসময় এসব নিয়ে চিন্তা করতে করতেই ছাদে চলে যায় ও । ফুল গাছে  
পানি দিতে দিতেই কে যেন ওর নাম নিয়ে ডাক দেয় ওকে।

:একি, তন্দ্রা! তুমি এখানে?

:আপনি? আপনি আমাদের ছাদে কি করছেন?

:সেটা তো আমারও প্রশ্ন!

:এ বাড়িতে আমরা থাকি, তিন তলায়।

মুঠো ডরা বোদ



:তাই? আমরাতো আজই আসলাম এ বাড়িতে । তিন তলার উত্তর দিকে ফ্ল্যাটে।

:ও। তাহলেতো দেখা হবে।

:হুম, তাতো হবেই। মুখোমুখি দরজা যেহেতু । আসি তাহলে গোছগাছ এখনও বাকি।

অয়নের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে তন্দ্রা। এ কি ইশারা খোদা?

এরপর থেকে প্রায়শই বিকালে কিংবা সন্ধ্যায় অয়নের সাথে ছাদে দেখা হতে থাকে তন্দ্রার । এবং আস্তে আস্তে এই দেখা করাটা একসময়ই প্রতিদিনই হতে থাকে । এর মাঝে তন্দ্রাকেও 'আপনি' থেকে 'তুমি' তে পদোন্নতি দেয় অয়ন । এমনই একদিন হঠাৎইক অয়ন প্রশ্ন করে বসে তন্দ্রাকে।

: Do you like me?

:বুঝলাম না।

কিছুটা অবাক হয়েই বলে তন্দ্রা।

:নাহ, মনে হল তাই বললাম আর কি। হাহাহা!!!.....

এরকমই চলছিল , তন্দ্রা আর অয়নের । হয়ত অয়ন কখনও সেদিনকারমত কতগুলো আবেগের কথা বলে । আবার কখনও তন্দ্রা তার মিষ্টি গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনায়। অয়নের অনার্স পরীক্ষাও শেষ হয়ে যায় এরইমাঝে।

অয়নের হেঁয়ালীপূর্ণ কথা তার আবেগ তন্দ্রাতে পরি পূর্ণতা পাবার আগেই ইউকে তে পাড়ি জমায় অয়ন , তন্দ্রাকে তার ভালবাসার তন্দ্রায় রেখে । তখনও বুঝে উঠতে পারে নি তন্দ্রা, ওর মন আসলে কি চাচ্ছিল।

মুঠো ডরা বোদ

প্রায় এক বছরের বেশি হয়ে গেছে অয়ন তন্দ্রাকে রেখে গেছে । কাল রাতে মেইলটা আবারও পড়ার পর আজ হঠাৎ করেই জয়দেবপুরে এসেছে তন্দ্রা, তাও ট্রেনে । কত মধুর স্মৃতিই তো আছে এখানে অয়নের সাথে। ঠিক করে এখানে বসেই মেইলের উত্তর তা দেবে ও । ল্যাপটপটা ব্যাগ থেকে বের করে মেইলের উত্তর লিখতে বসে তন্দ্রা।

"তন্দ্রা হয়ত জানেই না কারও ভালবাসায় সে আয়নিত । তাই সে হয়ত কখনওই বলে উঠতে পারে নি । হয়ত আমার লাজুকতাও কাজ করেছিল এতে। কিন্তু কেউ যদি সরাসরি বলত , তবুও কিন্তু সে কখনই না করে উঠত না । তন্দ্রাতো তন্দ্রা ছেড়ে সবসময়ই দেরি করে , এবারও নাহয় করল।"

মেইলটা সেভ করতে যেয়েও তন্দ্রার হাত কাঁপছিল । পাঠাবে কি পাঠাবে না এই দ্বিধা দ্বন্দ্ব তন্দ্রা এখনও ভুগছে । এই সময়ে স্টেশনে একটা ট্রেনের হুইসেলের শব্দ পেয়ে সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে মেইলটা পাঠিয়েই দেয় তন্দ্রা।

অয়নের ভালবাসাতেই আয়নিত হয়ে সারাজীবন নাহয় তন্দ্রাছন্নই থাকল তন্দ্রা!!!

নিশাত রহমান

ই-মেইল: nishat-rahman17@live.co.uk

মুঠো ডরা বোদ



## ভালবাসার বৃষ্টি

আজকে, এই সোনিয়া দেখ দেখ সেই ছেলেটা কলেজের সামনে দাড়িয়ে আছে জানালার পাশ থেকে ফারিহা ডাক দেয়। ‘ বেশ কিছুদিন ধরেই ছেলেটা কে দেখছে ওদের পেছনে ঘুরঘুর করছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল কার পেছনে ঘুরছে সেটা বের করতে পারছে না ওরা চার বান্ধবী। কারন ওরা চার জনই এক সাথে কলেজে আসে আবার এক সাথেই বের হয়ে যায়, ঘুরতে গেলেও একসাথে। তাই ছেলেটা ওদের কে যখনই দেখে এক সাথে। কাকে পছন্দ করে সেটা একে অন্যের উপরে চাপিয়ে দিলেও মনে সূক্ষ্ম আশা ছেলেটা যেন তার পেছনে ঘুরে। ফারিহার ডাক শুনে সোনিয়া, তব্বী দৌড়ে আসে। মীম যেখানে ছিল সেখানেই বসেই থাকে। দেখছে ছেলেটাকে, বুঝলি সোনিয়া ছেলেটার মোটেও ড্রেস সেন্স ভাল না , দেখছিস কি পড়ে আছে, ক্ষেত কোথাকার, তব্বী বলে উঠে। আরে ধুর এই ছেলের আবার ড্রেস সেন্স। কি যে বলিস সায় দেয় সোনিয়া, এই মীম তুই বসে বসে কি করছিস, বিদ্যাসাগরের ছোট বোন হতে চাস এদিকে আয় ? , ছেলেটা কে দেখ মনে হয় তার আর কাপড় নেই বলে হিহি করে, হেসে উঠে ফারিয়া। বিরক্ত হয় মীম। ফারিহা দেখতে অনেক সুন্দর সম্ভবত, কলেজের সেরা সুন্দরী। প্রায়ই দেখা যায় কিছু ছেলে পেলে ওর পেছনে ঘুরছে। তাতে অবশ্য ফারিয়া বেশ মজাই পায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানালার পাশে গিয়ে দাড়ায়। ছেলেটা ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না তারপরও মীম এর কাছে ছেলেটাকে অনেক কিউট লাগল। মীম ফারিহার মত আহামরি সুন্দর না হলেও আট দশটা মেয়ের সাথে দাড়ালে ওকে আলাদাই লাগবে।

ক্লাস শেষ করে ওরা যখন কলেজ থেকে বের হচ্ছে তখনও ছেলেটি সেই একি জায়গায় দাড়িয়ে। চল ওকে গিয়ে ধমক দেই প্রস্তাব দেয় সোনিয়া, তব্বী, ফারিহা তো এক পায়ে খাড়া, বাধা দেয় মীম। আরে বাদ দে। বাসায় কাজ আছে, চল চলে যাই। এই দাড়া, তুই এত ভীতু কেন রে মীম ? ছেলেটাকে ভড়কে দিব অনেক মজা হবে। , তব্বী বলে উঠে। কি আর করা হচ্ছে না থাকলেও মীমকে যেতে হয়।

মুঠো ডরা বোদ

এই আপনি আমাদের পিছু নেন কেন কলেজের সামনেও প্রায়ই? দাঁড়িয়ে থাকেন, আপনার সমস্যাটা কি আপনি জানেন ইভটিজার বলে আপনাকে ? , সোনিয়া বেশ রাগী রাগী ভাব নিয়ে বলল ? পুলিশে দিতে পারি আশা করল ছেলেটা ভয় পাবে।

কিন্তু ছেলেটা ভয় তো পেলই না বরং ওদের অবাক করে দিয়ে হাসল। বলল না আপনারা পারেন না , কারন আমি তো ইভটিজিং করিনি বরং আপনারা এখানে এসে আমাকে হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন। জানেন আপনারদের বিরুদ্ধে ১৫৭ ধারার কেস করতে পারি নিরহ একটা ছেলেকে হুমকি ? দেবার অজুহাতে। খতমত খেয়ে যায় সোনিয়া। চুপ করে থাকে। প্রথম দেখাতেই ভালবাসা বিশ্বাস করেন ফারিহার দিকে তাকিয়ে বলল। ? উত্তরের আশায় না থেকে নিজেই জবাব দিল আমিও করতাম না , কিন্তু এখন করতে বাধ্য হচ্ছি , তাকে দেখার পর থেকে লাইফ টা কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে , অন্যরকম অনুভূতিতে ছেয়ে আছে মন , চিন্তা ভাবনা যেন তাকে কেন্দ্র করে বৃত্ত হয়ে চারপাশে ঘুরছে। রাতগুলো নির্ধুম স্বপ্নগুলো, কেমন জানি এলমেলো। মনে হচ্ছে তার জন্য সব কিছু করা যায় , হা সব কিছু। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, সে আসবে বলে, আমায় বলবে, এই অনেক হয়েছে এখন হাতটা ধর , দেখতো টিপটা ঠিকমত হয়েছে কিনা ? বলতে বলতে ছেলেটার চোখ দুটো স্বপ্নিল হয়ে উঠে। দেখতে ভালই লাগে ওদের।

আপনি কাকে পছন্দ করেন সোনিয়ার প্রশ্নে থামে ছেলেটা। ? যদিও ওরা ভেবে নিয়েছে কে হতে পারে।

সরি তার নাম বলা যাবে না আমি চাচ্ছি সে যাতে নিজেই সেটা বোঝতে, পারে কাকে আমি ভালবেসেছি। অনেকের মাঝে থেকেও আমার অনুভূতি গুলো যেন সে ধরতে পারে। ততদিন পর্যন্ত আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব তার পথ চেয়ে। আচ্ছা আমি আপনারদের দেরী করিয়ে দিচ্ছি , সরি। যদিও আমার খুব ভাল লাগছে। বাই দা ওয়ে আমি রাজিব

এই চল যেতে হবে বকবক শুনলে হবে না। ফারিহা ওদের টেনে নিয়ে আসে। ফারিহা দেখছিস ও কত রোমান্টিক রাস্তার পাশ দিয়ে হাটতে ? হাটতে তব্বী বলে। ইস আমাদের তব্বী সেই খেত ছেলের প্রেমে পরে গেল , হায় প্রেম কিছুক্ষন আগেও যার ! ড্রেস সেল নিয়া প্রশ্ন ছিল , এখন কিনা তার প্রেমেই পরে গেল। পাশ থেকে সোনিয়া বলে উঠে। এবার তব্বী খেপে

মুঠো ডরা বোদ



যায়। বলে আমি না হয় ড্রেস সেল নিয়া বলছি , আর তুই সাহসী সিংহী , ছেলেটার সামনে গিয়ে এমন বিলাই হইলি কিভাবে?হুম ?? বল বল?  
আরে আমি কি জানতাম নাকি ও কিসব ধারা টারার কথা বলে আমাকে ভড়কে দিবে , বলে সোনিয়া , তাকিয়ে দেখে মীম হাসছে। কিরে এতক্ষন তো চুপ ছিলি এখন তোর কি হল? এত হাসির কি আছে।  
এত সাহসী একজন কে ভয়ে সিধিয়ে যেতে দেখে হাসব না , তোকে ছেলেটা বোকা বানাল বলে হাসছি। ১৫৭ ধারা হইল পার্কিং ছাড়া রাস্তার পাশে গাড়ি রাখার কেস।মীম হেসে জবাব দেয়।  
তুই জানলি কিভাবে এবার তব্বী প্রশ্ন করে।আরে ওই দিন আমাদের গাড়ি ? ,এই কেস খায় ট্রাফিক পুলিশ কে বলতে শুনছি।  
তুই তখন বললি না কেন ? ফাজিল কোথাকার। সোনিয়া রেগে যায়।হিহি আমি যদি বলে দিতাম তাহলে কি তোর ওই সাহসী রূপ দেখতে পারতাম, হাহাহা ?? হাসতে থাকে মীম।  
এই তোরা খামতো। কি সব শুরু করছিস। ফালতু একটা ছেলেকে নিয়া হাসাহাসি। ফারিহা কৃত্রিম রাগ দেখায়। ওর কথা শুনে বাকিরা ফিক করে হেসে দেয়। তব্বী বলে আসলেই কত ফালতু ছেলে নইলে কি আর ধবল, ?রোগির প্রেম এ পরে আমরা কি ছিলাম না হে হে। আসলেই,রোগির জন্য বেচারার ঘুম নষ্ট , দিন রাত খালি পাউডার আপার স্বপ্ন , সোনিয়া যোগ করে। এই খবরদার ফাজলামি করবি না। ফালতু কথা শুনতে একদমই ভাল লাগে না।হয় তোরা চুপ কর নইলে আমি গেলাম। ফারিহা এবার সত্যই রেগে যায়। আচ্ছা বাবা ঠিক আছে আর তোকে খেপাব না , তবে এটা ঠিক তোর কপাল ভাল।এত কিউট , রোমান্টিক একটা ছেলে তোকে পছন্দ করে , এত দিন ধরে তোর জন্য দাঁড়িয়ে থাকে , কল্পনা করা যায় , তাও আবার এই যুগে , যেখানে ২ মিনিটে প্রেম আর ৪ মিনিটে ব্রেক - আপ। তুই স্পেসাল রে দোস্তু। আসলেই স্পেসাল। আমার জন্য দাড়ালে তো এক পায়ে রাজি হতাম, বলে মীম। অফ যা তো তোরা বললেও শুনতে ভালই লাগছিল ফারিহার।

পরদিন কলেজ ছুটির পর আবার রাজিবের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ওরা। ফারিহাই শুরু করে , ভাব নিয়ে বলে দেখুন আপনার মত ছেলে অনেক দেখেছি, সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তার পেছনে ঘুর ঘুর করেন , তার প্রেমে পরে যান, তার জন্য হেন করবেন তেন করবেন। যতসব সস্তা মেন্টালিটি।

মুঠো ডরা বোদ



শুনুন প্লিজ আমাদের আর ডিস্টার্ব করবেন না। নাহলে আমরা স্যারদের জানাতে বাধ্য হব।

আপনার কেন মনে হল যে আমি সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তার প্রেম এ পরে', যাই আর এমন যদি হত তাহলে তো আমি সবার আগে আপনার প্রেম এ পরতাম। কিন্তু আমি তো আপনাকে পছন্দ করি না। আমি ভালবাসি মীম কে। মীম আমি জানি না তোমার জবাব কি হবে, তবে যাই হোক আমি আর পারছি না। এভাবে দিনের পর দিন তোমার অপেক্ষায় থেকে আমি ক্লান্ত। আমি আগামী কাল ঠিক এসময় তোমার জবাবের অপেক্ষায় থাকব, বলে হাটা শুরু করে রাজীব। হতভম্ব মীম তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কান দিয়ে যেন ধোঁয়া বের হচ্ছে। ও স্বপ্নেও ভাবেনি ফারিহাকে বাদ দিয়ে রাজীব ওকে প্রপোজ করবে।

একটা ছেলে ওকে এত ভালবাসে, এত দিন ধরে ওর জন্য অপেক্ষা করছে ভাবতেই কেমন জানি লাগে। বুকের বাম পাশে কেমন জানি অচেনা অনুভূতি। এ অনুভূতির সাথে সে কখনোই পরিচিত না। কিশোরী একটা মেয়ের জন্য এই অনুভূতির মূল্য অনেক। রাতের আকাশ দেখতে ভাল লাগছে, গুন গুন করে গান গাইতে ইচ্ছে করছে। মন ভরে আছে অচেনা এক ভাল লাগায়। কখন সকাল হবে কখন কলেজে যাবে এই চিন্তায় ঘুম আসছে না ওর, নিষ্ঠুর রাত যেন ফোরাতেই চাচ্ছে না। সোনিয়া কল দিয়েছিল, জানতে চেয়েছিল ওর জবাব কি হবে, মীম সত্য কথায় বলে দিয়েছে। এতক্ষণে নিশ্চই সব বান্ধবীরা জেনে গেছে ব্যাপারটা, সোনিয়াটা যা ফাজিল। আপন মনে হাসে মীম।

ফিজিক্স ক্লাস শেষ হতেই ফারিহার ডাক, তুই নাকি হা বলবি ছেলেটার? ব্যাপারে জানিসকিছু নাকি এমনি তেই প্রেম এ পরে গেলি? তুই কি আজীবন গাধীই থাকবি?

কেন কি হয়েছে? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে মীম।

আরে বলিস না ওই ছেলে দুনিয়ার বদ, ওর কাজ ই হচ্ছে সহজ সরল মেয়েদের মিষ্টি কথা বলে পটানো, কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে। আর তুই কিনা ওর প্রেমে পরে গেছিস। কয়েক দিন আগে দেখিস নি এক RJ কে লাইভ প্রোগ্রামে একটা মেয়ে জিজ্ঞেস করল আর কয়টা মেয়ের সর্বনাশ করবা তুমি এরা হচ্ছে মুখোশধারী শয়তান।? এদের মিষ্টি কথায় বিশ্বাস করতে নেই।

মুঠো ডরা বোদ



ফারিহার কথায় যেন পায়ের নিচে মাটি সরে গেল মীমের। এও সম্ভব? ছেলেটা কে তো এমন মনে হয়নি। মনটাই খারাপ হয়ে গেল ওর। অনেক কষ্টে জিজ্ঞেস করল, তুই সিউর তো?

আমি কি তোর সাথে মিথ্যে বলব তুই বি? সেকশনের ইলা কে চিনিস না? ওকেও প্রপোজ করেছে। দাড়া ইলা কে ডেকে আনি। বলে ক্লাস থেকে বের হয়ে গেল ফারিহা।

ভীষণ কান্না পাচ্ছে মীমের। ঠোট কামড়ে কান্না চাপার চেষ্টা। কেন এমন হল ভালবাসা ছিল না? সাজানো স্বপ্নগুলো তাই বলে এভাবে ভেঙ্গে যাবে? জীবনে ভালই তো ছিল সে কেন ভালবাসে তে গেল কেন একটা মানুষের? নির্ভুর খেলায় সে কষ্ট পাবে। অভিমান গুলো একসময় প্রচণ্ড ক্ষোভে পরিণত হয়। ইলা এসে কি বলল তার কিছুই মাথায় ঢুকেনি। বেশ কিছুক্ষণ কাঁদতে পারলে হয়ত ভাল হত।

কলেজ ছুটির পর বের হবে হঠাৎ রূপ বৃষ্টি। কি আর করা যাদের কাছে ছাতা নেই সবাই গেট এর পাশের ছাউনিতে আশ্রয় নিল। এই মীম দেখে বদমাশটা ছাতা হাতে এদিকে আসছে, ফাজিল কোথাকার, একটা শিক্ষা দিতে পারলে ভাল হত। মীম পারবি ব্যাটাকে একটা চরম শিক্ষা দিতে? ফারিহা উৎসাহের সাথে বলল। এই না না বাদ দে তো এসব আমার ভাল, লাগছে না প্রতিবাদ করল সোনিয়া। এই হাঁদারামটাকে আজকে না তোর জবাব দেয়ার কথা যা জবাব দিয়ে আয়। দেখিস আবার রাজি হয়ে না? যাস। কত কিউট ছেলে রে খোঁচা মারে ফারিহা, ফারিহার কথা শুনে মাথায় আগুন ধরে যায় মীমের, বৃষ্টি ভিজতে ভিজতে রাজিবে দিকে এগিয়ে যায়। দূর থেকে দেখে ফারিহা, ছেলেটা ছাতা হাতে দৌড়ে আসে, মীম এর উপর ছাতা ধরে, তখনি এক ঝটকায় ছাতাটা ফেলে দেয় মীম। মীম উত্তেজিত ভাবে কি যেন বলে রাজীব কে, রাজিব ও কিছু বলে জবাব দেয়। ফারিহা সোনিয়া স্তব্ধ হয়ে যায় যখন দেখল মীম ছেলেটা কে চর মেরেছে। ছেলেটার দৃষ্টিই বলে দিচ্ছিল সে কতটা অবাক হয়েছে।

জ্বর নিয়ে বাসায় ফিরল মীম। বিছানায় পরে সারাদিন ই কাদল। কিছুতেই ব্যাপারটা ভুলতে পারছে না। জ্বরের কারনে কয়েকটা দিন কলেজে যাওয়া হয়নি। এ কয় দিনে মীম কেমন জানি হয়ে গেছে, শুকিয়ে একদম কাঠাদল বেধে ওকে দেখতে আসল সোনিয়া, ফারিহা, তন্নি। ওর অবস্থা

মুঠো ডরা বোদ



দেখে ফারিহার কান্না পেয়ে গেল। হিংসার বশীভূত হয়ে বান্ধবীর এর বড় ক্ষতি করে ফেলবে বুঝতেই পারেনি। ও তো বুঝতে পারেনি যে মীম ছেলেটা কে এত ভালবেসে ফেলবে। মীম কে সব খুলে বলল। ওরা ভাবতেও পারেনি ফারিহা এমন করতে পারে , রাজিবের ব্যাপারে যা বলেছিল সব মিথ্যে। ফারিহা কে বাদ দিয়ে মীম কে প্রপোজ করায় সে জেলাস ফিল করে বলে এমন করেছে। ইলাকেও সে শিথিয়ে দিয়েছিল। ফারিহার কান্না দেখে মীম ওকে মাফ করে দেয়। যা হবার তো হয়েছেই। ফারিহা কথা দেয় সবাই মিলে ওরা রাজীব কে খুজে বের করবে। শুধু নামটাই ওরা জানে , রাজিব কোথায় থাকে , কোন উনিতে পড়ে কিচ্ছু জানে না। তাই ফেসবুক ই এক মাত্র ভরশা। হাজার হাজার রাজিব , কিন্তু সেই রাজীব কে তো আর পাওয়া যায় না , সবার আবার প্রোফাইল পিকচারে নিজের ছবি নেই। এভাবে সময় চলে যায় ওরাও এক সময় ক্ষান্ত দেয়। শুধু ভুলতে পারে না মীম। প্রথম ভালবাসা কি এত সহজে ভোলা যায়। হোক না সেটা একদিনের ভালবাসা।

প্রায় দুমাস পর বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স থেকে চার বান্ধবী শপিং করে বের হবে এমন সময় তব্বী বলে এই দেখ তো ছেলেটা রাজীব না আরে ? যদি আশা ভেঙ্গে, ফারিহা বলে। ভয়ে ভয়ে তাকায় মীম , মীম দেখ , তাই তো যায়। আসলেই তো ছেলেটা রাজীব এর মত দেখতে , তবে ভীষন রোগা, গায়ের রঙ টাও কেমন , রাজিব আরো ফর্সা। পাশের মেয়েটা কে আবার ? সোনিয়া জিজ্ঞেস করল।

মীম অবশ্য এত কিছুর ধারে গেল না , সোজা সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল , এত দিন কথায় ছিলে তুমি ? জান ক্লাসের জানালার পাশে দাড়িয়ে কত অপেক্ষা করেছি তুমি আসবে বলে ? এলে না কেন আমার রাগ ভাঙতে , জানি ভুল টা আমারি , কিন্তু ক্ষমা চাইবার সুযোগ তো দিবা। অফ্র টলমল চোখে মীম বলে। পাশের মেয়েটে হা করে তাকিয়ে থাকে।

আপনি আমাকে কিচ্ছু বলছেন ? কই আমি তো আপনাকে চিনি না , ছেলেটা বলল। রাজিব কেন আমাকে আরও কষ্ট দিচ্ছ আমার উপর তুমি ? এখনো রেগে আছ গত দুটা মাস আমি কিভাবে যে কাটিয়েছি তা যদি বোঝাতে পারতাম। কান্নাভেজা কণ্ঠে মীম বলে।

মুঠো ডরা বোদ



ও আপনি রাজিবের পরিচিত ? রাজিব আমার জমজ ভাই। দুমাস আগে  
একটা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়, আশ্তে আশ্তে বলে ছেলেটা।

শুনে আর স্থির থাকতে পারে না মীম, মাথা ঘুরে আসে ওরা। আকাশ যেন  
ভেঙ্গে পরছে। মেঝেতে পরার আগেই ছেলেটা ধরে ফেলে ওকে, কানে  
কানে হেসে বলে এত ভালবাস আমাকে আমি তো এতক্ষন মজা ?  
, করলাম ওইদিনের পর অবশ্য ভাবি নাই তুমি আমাকে ভালবাসতে পার ,  
বলে বুকে জড়িয়ে ধরে রাজিব। সেই দিনের মত করে আজ ও বৃষ্টি নামে ,  
হাত ধরে দুজন নেমে যায় বৃষ্টি ভিজবে বলে । পাশ থেকে সেই মেয়েটা  
বলে উঠে , ভাইয়া নিউমোনিয়া বাধিয়ে দুমাস বিছানায় ছিলো আবার  
থাকতে চাও। এই শব্দ গুলো কানে যায়না, ওরা বৃষ্টি ভেজায় মগ্ন। এ বৃষ্টি  
ভালবাসার বৃষ্টি , যা মুছে দেয় সব দুঃখ কষ্ট। চলুন না ওদের সাথে  
ভালবাসার বৃষ্টি তে ভিজে।

মেঘেরদেশ

ইমেইল : saifulcml@gmail.com

মুঠো ডরা বোদ

## প্রেম !

১.

শেষ রাত্তিরে ট্রেনের হুইসেলটা বড্ড আওয়াজ দেয়  
ট্রেন চলে ঢাকা চিটাগং  
বুকের ভিতর অহর্নিশি হুইসেল বাজে, আতর্নাদে  
প্রার্থনা আর তুমি, রঙ ঢং  
তুমি সীমান্ত ছেড়ে দুহাত তোলো স্বাধীনতা মুঠোয়  
সীমান্ত, আমার চোখ  
আমি আজীবন বুভুক্ষু, চারদেয়ালে হাতড়ে মরি রোজ  
চাতক পাখি, তৃষ্ণায় কাতর!  
ভিজে কুয়াশায় পদচিহ্ন, কিসব আঁকি উকি ঝড় তোলে  
সীমান্ত মুঠোয় ভরি  
আমি গন্ধ ছুয়ে তোমার পথ চিনি, পথচারী হই  
আমি যমদূতের শব্দের আগে প্রেম হই!

২.

বিষধর প্রাণীগুলো শ্বাস প্রশ্বাসে অন্ধকার বানায় ঘর  
চারিদিকে মৃত্যুর হাতছানি  
ফণাতুলে আধিপত্যের জানান দেয় সর্বগ্রাসী দল  
তোমার ভাবনাগুলো নির্লিপ্ত  
আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ রাখি, তোমাকে আমার চাই  
এক সমুদ্র মৃত্যু ভয়, বড্ড তুচ্ছ মনে হয়।

মুঠো ডরা বোদ



## আমার বসন্ত

আজকাল পাতা ঝড়ার শব্দটা কানে লাগে  
শুকনো পাতায় নুপুরের সুর  
আমি জানি হেটে আসছ কেউ, স্মিত হাসিতে  
খোপায় গুজে থাকা ফুলের গন্ধটা ও টের পাচ্ছি  
আজকাল পায়ের শব্দেই আমি ঋতু চিনি  
এখন যেমন চোখ বুজেই বলতে পারি, বসন্ত।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ফুল না দেখে বসন্ত  
বলার মতো আমি কেউ না; ফুলের গন্ধ খুঁজি  
ফুলের নাম জানি না, কেবল জানি তার সৌরভ  
ফুল মাথায় গুজে কেউ আসছে দিবি জানি  
আমার কাছে সুখ মানেই বসন্ত, ফুলের সৌরভ।

জ্যোৎস্নাগুলো ও বাধন হারা, অন্যরূপ  
পাতার শব্দ, জ্যোৎস্নায় রবীন্দ্র সুর  
প্রকৃতি রোজগেরে চিন্তা ছেড়ে বড্ড উদাস  
আমি বাতাসে কান পেতে বসন্ত বুঝি  
চোখ জুড়ানো দিন রাত্রি, হাসি খুশি আকাশ  
অনাবিল সুখে বেচে থাকাটাই, বসন্ত আমার।

আশরাফুল ইসলাম দুর্জয়

ই-মেইল: ashraf\_bd87@yahoo.com

মুঠো ডরা বোদ

## তানিয়া ম্যাডাম

আমি জানি আমার এই লেখাটা পড়লে তানিয়া (সংগত কারনেই ছদ্মনাম) ম্যাডাম খুব রাগ করবেন। আমার সাথে হয়তো বা আর কখনো কথাই বলবেন না। আমাকে হয়তোবা ভয়ও পাবেন। মোট কথা তানিয়া ম্যাডামের সাথে সব যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। তবু আমি গল্পটা লিখছি। কারন তানিয়া ম্যাডামের কাছে আমার সব অপরাধ স্বীকার করতে হবে আজ রাত বারোটীর মধ্যে। নয়তো তানিয়া ম্যাডাম মারা যাবেন।

ব্যাপারটা বেশ উভয় সংকটের। আমি যদি আজ তানিয়া ম্যাডামের কাছে সবকিছু স্বীকার না করি তবে তিনি মারা যাবেন আর যদি করি তবে তিনি আমাকে অনেক খারাপ ভাববেন। আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেবেন।

ভাল কিছু পেতে হলে কিছু স্যাফ্রিফাইস করতে হয়। আজ নাহয় আমি তানিয়া ম্যাডামের জীবনের জন্য তার সাথে যোগাযোগটা ছিন্ন করি। তাইতো আমার এ লিখতে বসা কাগজ কলম নিয়ে।

গল্পটা তবে শুরু করা যাক। তানিয়া ম্যাডামের সাথে আমার প্রথম দেখা আমি যখন ক্লাস ইন্ট্রোডাকশনের ছাত্র। প্রথম দেখাতেই তাকে এতো ভাল লেগে গেল যে আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম তিনি আমার দৃষ্টির বাইরে যাবার আগ পর্যন্ত। আমি তখনও অবশ্য জানতাম না যে তিনি এই কলেজের একজন টিচার, ছাত্রী নন। এত বয়েসেও বয়স যে কুড়িতে ধরে রাখা যায় তা আসলে উনাকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। অবাক হলাম তাই। সেই সাথে খেলাম হোঁচট। তবু দমিয়ে গেলাম না। আমার প্রথম ভাল লাগাকে আমি যে করে হোক স্বার্থক করে তুলব- পণ করলাম।

মুঠো ডরা বোদ



প্রতিজ্ঞা করা যতটা সহজ , বাস্তবে তা অর্জন করা ঠিক ততোটাই কঠিন। আমার ক্ষেত্রে এ তো আরো দুঃসাধ্য। কারণ , ম্যাডাম অর্থনীতি পড়ান আর আমি পড়ি সায়েন্সে! তাই ম্যাডামের সাথে কথা বলা তো দূরের কথা ম্যাডাম কে পাঁচটা মিনিটের জন্য চোখের দেখাটাও কঠিন হয়ে যায়। তবু মাঝে মাঝে আমি আমার খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লাসগুলো বাদ দিয়ে , সাহস করে অর্থনীতি ক্লাসে ঢুকে পড়ি। আর ম্যাডাম কে দুচোখ ভরে দেখি। যত দেখি ততো মুগ্ধ হই। আমার মুগ্ধতা ধীরে ধীরে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে , ম্যাডাম কে দেখার জন্য প্রতিটা মুহূর্ত ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করি। ম্যাডামের সাথে কথা বলারও ইচ্ছে জাগে। কিন্তু ম্যাডাম আমার সাথে কথা বলবেনই বা কেন ? দুজন যে দুই জগতের মানুষ। তার উপর বয়েসের এতো ব্যবধান !

উপায়ান্তর না পেয়ে একদিন তাকে গিয়ে বললাম , ম্যাডাম, আমি আপনার কাছে পড়তে চাই। একটা সময় দেন। হাতে রাখা ডায়েরীটার কয়েকটা পাতা উল্টিয়ে তিনি বললেন শনি, সোম, বৃহ বারের ব্যাচে একটা সিট খালি আছে। সকাল আটটার ব্যাচ। আমি বললাম , কিন্তু ম্যাডাম আমি তো সায়েন্সের স্টুডেন্ট। ম্যাডাম অবাক হয়ে ভ্র উল্টালেন, তবে অর্থনীতি পড়বে কেন ? অর্থনীতি না ম্যাডাম , বাংলা পড়ব। বাংলায় আমি খুব কাঁচা। আপনি যাস্ট আমাকে পড়া দেবেন , আর নেবেন। প্লি -জ ম্যাম আমার এইটুকু উপকার করেন। আমার কাতর অনুনয় শুনেই কি না জানি না , উনি আমাকে পড়াতে রাজী হলেন।

শনিবার থেকে শুরু হল আমার ক্লাসে যাওয়া । পড়ানোর রুমে বড় একটা টেবিল। টেবিলের চারপাশ জুড়ে এগার জন ছাত্র। আমি বারোতম। বসলাম ম্যাডাম যে চেয়ারে বসেছেন তার ঠিক উল্টো দিকে। টপিকটা চাহিদা ও যোগান। চাহিদা বাড়লে যোগান বাড়ে, চাহিদা কমলে যোগান কমে। মনে প্রশ্ন জাগে, অর্থনীতি কি আমার চাহিদার কোন যোগান দিতে পারবে?

যাই হোক, এভাবে নিয়মিত যেতাম ম্যাডামের কাছে। শনি, সোম, বৃহ। শনি, সোম, বৃহ। ভাবতাম সপ্তাটা যদি তিন দিনে হত ! ম্যাডামের সামনে বসে

মুঠো ডরা বোদ

অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতাম ম্যাডামের চোখে। একটা মানুষ কিভাবে এতো সুন্দর হয়! কিভাবে একটা মানুষ এতো সুন্দর করে কথা বলে! ম্যাডাম কে দেখতাম আর স্বপ্নের দেশে চলে যেতাম তাকে নিয়ে। ম্যাডাম কিন্তু এর কিছুই বুঝত না। অথচ আমি চাইতাম ম্যাডাম আমার মনের কথাগুলো বুঝুক। আবার ভাবতাম, বুঝলে যদি আমাকে ধমক দেয়, আমাকে তাড়িয়ে দেয়। তাই আমার কাছে ম্যাডাম কে পাওয়া মানে ছিল, কেবল ম্যাডামের সামনে মাত্র এক ঘণ্টা বসার সুযোগ পাওয়া-এর বেশী কিছু না।

কিন্তু কথায় আছে না, বসতে দিলে মানুষ শুতে চায়। আমার কেবল ম্যাডামকে এক ঘণ্টা দেখে হচ্ছিল না। আমি আরো বেশী কিছু চাইছিলাম। ম্যাডামের সাথে কথা বলতে চাইছিলাম। ম্যাডামের সাথে ঘুরতে চাইছিলাম। ম্যাডামকে আরো, আরো কাছে পেতে চাইছিলাম। তাই মাঝে মাঝে, পড়ার সময় ছাড়া অন্য সময়ও, পড়াশুনা সংক্রান্ত টুকিটাকি প্রবলেম নিয়ে ম্যাডামের বাসায় যাওয়া শুরু করলাম। ম্যাডামের ৪ বছর বয়েসের মেয়েটার সাথেও খাতির জমানো শুরু করলাম।

আরো একটা কাজ শুরু করলাম আমি। শুনলে আপনারা কে কিভাবে নেবেন জানিনা, আমি কিন্তু কাজটা খুব সিরিয়াসলি নিয়েছিলাম।

কাজটা কি তা বলা যাক। একদিন ইন্টারনেট ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ একটা সাইট খুঁজে পেলাম যাতে লেখা:

Whether it be power money fame revenge love or hate... the universe can be bent to our will and it can all be achieved with spells and magic.

হ্যা, সাইটটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের। কথাগুলো আমার অপরিণত মনে খুব দাগ কাটলো। আমরা সব কিছুই পেতে পারি ম্যাজিক দিয়ে! এমনকি আমি আমার তানিয়া ম্যাডামকেও পেয়ে যেতে পারি এই ম্যাজিকের জোরে!

মুঠো ডরা বোদ



কোন কিছু না ভেবেই আমি ম্যাজিকের চর্চা শুরু করে দিলাম। সাইটটা তে এতো চমৎকার ভাবে সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে , এতো চমৎকার ভাবে বলে দিচ্ছে কখন কি করতে হবে , আমি পুরোপুরি অভিভূত হয়ে গেলাম। যিনি সাইটটি তৈরী করেছেন তার মতো করে আমিও ভাবতে থাকলাম আমার দ্বারা, মানে আমার ম্যাজিকের দ্বারা এখন সবকিছুই করা সম্ভব। প্রতিদিন রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন আমি দরজা জানালা লাগিয়ে শুরু করতাম আমার ম্যাজিক চর্চা। যতই দিন যাচ্ছিল ম্যাজিক করায়তু করায় আমার দক্ষতা ততই বাড়ছিল। প্রথম ধাপে স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণে দক্ষ হয়ে গেলাম। আমি প্রতি রাতেই ম্যাডামকে স্বপ্নে দেখতে পারতাম। বাস্তবের না পারা কাজগুলো স্বপ্নে করতে পারতাম অবলীলায়। ম্যাডামকে নিয়ে আমার পরিচিত এমন কোন জায়গা নাই যেখানে ঘুরতে যাইনি। দুজন হাত ধরে হাটতাম ঘন্টার পর ঘন্টা।

আমি যেমন ম্যাডামকে স্বপ্ন দেখতাম , আমি ও চাইতাম ম্যাডামও যেন আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। এজন্য আমি প্রতি রাতে ঘুমুবার আগে একটা মন্ত্র পড়তাম। এ কাজে আমাকে প্রতিদিন গোলাপী রংয়ের কাপড় দিয়ে একটা ছোট বালিস তৈরী করতে হত যার ভেতরে তুলা ছাড়াও থাকত গোলাপ এবং জুঁই গাছের তাজা পাতা। আর থাকত এক টুকরো কাগজ যাতে গোলাপী রঙের কালিতে লেখা ম্যাডামের নাম। তারপর মেঝেতে একটা ম্যাজিক বৃত্ত ঐকে তার ভেতরে দাঁড়িয়ে নিচের মন্ত্রটি পড়তাম তেরোবার :

Blessed mother, Holy Goddess  
Send Tania a dream  
And awaken her mind  
Carry my voice far and galore  
To the place where even sleep lays ashore  
Send Tania this message loud and clear  
This is not just a prayer mere.

মুঠো ডরা বোদ

তেরোবার এই মন্ত্রটি পড়ে তারপর আমি ঘুমুতে যেতাম।

মন্ত্র তো ঠিকই পড়তাম কিন্তু ম্যাডামকে তো আর জিজ্ঞেস করতে পারতাম না ম্যাডাম আমাকে স্বপ্নে দেখেছেন কিনা। ছাত্র হয়ে কিভাবে একথা জিজ্ঞেস করা যায় আপনারাই বলুন। সাহস করে বেশ কয়েকদিন চেয়েছিলাম জিজ্ঞেস করি। কিন্তু অতোটা সাহসী বা অভদ্র কোন ক্যাটাগরীতেই আমি পড়ি না যে! তবে হঠাৎ একদিন ম্যাডাম নিজেই বললেন , হাসতে হাসতে বললেন , তোমরা জানো, কাল না আমি রাজুকে স্বপ্নে দেখেছি। শুনে আমি তো খুশিতে আতুহারা। লজ্জায় খানিকটা লালও হয়ে গেলাম বোধহয়। ম্যাডাম বললো , দেখলাম, আমি না রাজুকে খুব করে পেঁটাচ্ছি। বলেই সে কি হাসি। কি যে মধুর লাগছিল ম্যাডামকে তখন! স্বপ্নে যাই দেখুক না কেন আমার মন্ত্র যে কাজ করছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট হলাম , আর তন্ত্র-মন্ত্র আরো বিপুল বিক্রমে চালিয়ে গেলাম। আমার বিশ্বাস আরো বেড়ে গেল। এখন আমি জানি আমি ঠিকমতো মন্ত্র পড়তে পারলে একদিন না একদিন আমার ম্যাডামকে আমি পাবোই পাবো।

একমাস পরপর আমি আরো একটা মন্ত্র পড়তাম। মন্ত্রটা শুরু করতাম শুক্রবার থেকে। ভালোবাসার দেবী ভেনাসের এই দিনটা খুব নাকি পছন্দের। মন্ত্রটা পড়তে হতো পরপর সাত রাত। এই মন্ত্রটা পড়ার উপকরণগুলো হলো:

১. হার্ট আকৃতির একটা লাল কাপড়।
২. একটা লাল রঙের মোমবাতি।
৩. একটা আয়না।
৪. একটা সাদা কাপড়।
৫. সাতটা পিন।
৬. গোলাপ জল।

মুঠো ডরা বোদ



পদ্ধতি: গোলাপ জল মেশানো পানিতে গোসল করে সারা গায়ে আতর লাগিয়ে আপনার রুমে একটা ম্যাজিক অ্যারিয়া বাছাই করে সেখানে সাদা কাপড়টি বিছিয়ে দেন। কাপড়টির উপর আসন পেতে বসে হাতে হার্ট আকৃতির লাল কাপড় নিয়ে মোমবাতিটি জ্বালান। কাপড়টি আগুনে পুড়তে থাকুন আর বলতে থাকুন:

I call thee beloved one  
To love me more than any one  
Seven times I pierce my heart  
Today the magic of Venus starts  
I bind thy heart and soul to me  
As I do will, so let it be.

সাতবার মন্ত্রটি পড়ুন আর প্রতিবার পড়া শেষে একটা করে আলপিন নিজের বুকে ছোঁয়ান। দেখবেন কাজ হবেই। আমার বেলাও হচ্ছিল। কাজ যে হচ্ছিল এ বুঝতে পারতাম ম্যাডাম যখন আমার সাথে পড়াশুনা ছাড়াও বাইরের অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলতেন। তার বাবুকে নিয়ে কথা বলতেন। তার টিচারদের নিয়ে। তিনি যে টিচার হতে চান নাই এটাও বলেছিলেন একদিন। কথাগুলো ব্যাচে সবাই যখন পড়তাম তখন বলতেন আবার , মাঝে মাঝে আমি যখন একা পড়তে যেতাম তখনও বলতেন । রবীন্দ্র সংগীত নিয়েও একবার অনেক কথা হল। ম্যাডাম রবীন্দ্র সংগীত খুব ভালবাসতেন। একদিন তো ম্যাডাম আমাকে নিজের হাতে নুডুলস বানিয়ে খাওয়ালেন।

এভাবে যখন আমি আমার তন্ত্রমন্ত্রের কল্যাণে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ একদিন আমাদের মাঝখানে ভিলেন হয়ে আসলেন তানিয়া ম্যাডামের হাজব্যান্ড। হঠাৎ একদিন আমরা সবাই যখন ব্যাচে পড়ছি , তখন ম্যাডাম বলে উঠলেন, তোমাদের সাথে সম্ভবত এটাই আমার শেষ ক্লাস। আমি আর

মুঠো ডরা বোদ

বাসায় প্রাইভেট পড়াব না। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। অন্যরাও বোধহয় বিষয়টা মানতে পারছিল না। সবার মন খারাপ দেখে বিষয়টা ম্যাডাম এক্সপ্লেইন করলেন। বললেন, শোনো, কলেজ আর প্রাইভেটে সারাদিন ব্যস্ত থাকায় আমার মেয়েটাকে আমি সময় দিতে পারছি না। আর আমার পড়ানোর ব্যাপারটাও তোমাদের ভাই সহজে নিতে পারছেন না। তাই বাধ্য হয়েই এ সিদ্ধান্ত। ম্যাডাম দুঃখ প্রকাশ করে আমাদের বিদায় দিলেন।

জানি, ম্যাডাম বাধ্য হয়ে তার জামাইয়ের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। কিন্তু আমি কেন মানব? ম্যাডামের জামাই আমার তো আর কেউ না। আর আমি বুঝতে পারছিলাম আমাকে সরানোর জন্যই ম্যাডামকে এভাবে বাধ্য করা। আমার সাথে যে ম্যাডামের ঘনিষ্ঠতা দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে -এ নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন ভদ্রলোক। ম্যাডাম যেদিন আমাকে আদর করে নুডুলস খেতে দেন তখন, বোধহয় তার হাজব্যান্ড বাসায় ছিলেন। যাই হোক আমি কিন্তু দমিয়ে যাওয়ার পাত্র নই। হাজার হোক আমি এখন একজন পুরোদস্তুর কালো জাদুকর।

সারারাত ঘুম হলো না। এতটা মন খারাপ বোধহয় এর আগে আর কখনো হয়নি। এখন থেকে ম্যাডামের দেখাটাও পাব না। টেস্ট পরীক্ষা শেষ। কলেজে কোন ক্লাস নাই। ম্যাডামের হাজব্যান্ডের জন্যই আজ এই অবস্থা। কোন ভাবে যদি পথের কাঁটাটাকে সরাতে পারতাম! নিশ্চয়ই পারব। আমি তো এখন আমার ম্যাজিকের জোরে সব, সব কিছু করতে পারি।

শুরু করলাম পথের কাঁটা সরানোর প্রজেক্ট। আসলে এতোদিন যে ম্যাজিকগুলো করছিলাম সেগুলোকে পুরোপুরি ব্ল্যাক ম্যাজিক বলা যায় না। কারণ ওগুলো আমি কারো কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে করিনি। কিন্তু এখনকার ম্যাজিকটা সত্যিই ব্ল্যাক ম্যাজিক। ভায়াবহ ব্ল্যাক ম্যাজিক। এজন্য যা করতে হবে তা হলো:

মুঠো ডরা বোদ



কোন এক অমাবস্যার রাতে ঘড়িতে বারোটা বাজার পাঁচ মিনিট বাকি যখন তখন একটা কালো রংয়ের বিড়াল খুন করতে হবে। তারপর সেই বিড়ালের রক্ত দিয়ে নিজের দুই হাত রাঙিয়ে নিতে হবে। তারপর ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে কালো রঙের একটা মোমবাতি জালিয়ে দিতে হবে। একটা তের ইঞ্চি বাই তের ইঞ্চি কাগজে যার বিরুদ্ধে আপনার ম্যাজিক তার নামটি লিখুন তারপর বিড়ালের রক্ত দিয়ে নামটি কাটুন আর কাগজটি ধীরে ধীরে মোমবাতিতে পুড়াতে থাকুন। আর বলতে থাকুন

Sand from lands far away

Mr. Rajib (যাকে তাড়াতে চাচ্ছেন তার নাম) will go and I will stay

Both of us, happy will be

With Rajib far from me.

পুরো কাগজটা পুড়ে গেলে মোমবাতিটা নিবিয়ে ফেলুন। তারপর পরপর তের রাত ঠিক রাত বারোটায় তিনবার করে মন্ত্রটা জপুন। আপনার আদিষ্ট লক্ষ পূরণ হবেই।

কিন্তু ম্যাজিকটি শেষ হবার পর আরো মাস দুয়েক গেল। আমার পথের কাঁটা দূর হচ্ছিল না দেখে আরো কিছু তন্ত্রমন্ত্র করলাম যার বিশদ বর্ণনায় আর না যাওয়াটাই ভাল হবে। এভাবে করতে করতে হট করে একদিন খবর পেলাম ম্যাডামের হাসব্যান্ড নাকি রোড এক্সিডেন্টে মারা গেছে। খবরটা শুনে আমার খুশি আর ধরছিল না। আমি অবশেষে সফল হয়েছি। অথচ আশেপাশের সবাই হা-পিত্যেস করা শুরু করল। লোকটা নাকি খুব ভাল ছিল। কচু ছিল। আমার ম্যাডামকে আমার কাছে থেকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। কত বড় সাহস। ব্ল্যাক ম্যাজিক পুরোপুরি আয়ত্ত্ব করে নেয়া একজনের মনের মানুষকে নিয়ে সুখের সংসার গড়ার মজা বুঝুক এখন। সবাই মিলে বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার পোস্টমর্টেম শুরু করে দিল। কলেজের ছাত্ররা মিলে সড়ক অবরোধের ডাক দিল। কেউ কেউ সরকারের ব্যর্থতার কড়া সমালোচনা শুরু করল। করবেই তো। কেউ তো আর আমার ক্ষমতা সম্পর্কে

মুঠো ডরা বোদ

জানে না। কেউ তো জানে না চরম অধ্যবসায়ের দ্বারা আজ আমি কিরকম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেলাম।

যাই হোক পরদিন আর সবার সাথে আমি গেলাম ম্যাডামের বাসায় তাকে দেখে আসতে। কি আর বলব। ম্যাডামের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। এক দিনে ম্যাডামের সব রূপ লাভ্য কোথায় যে হারিয়ে গেছে! ছোট বাচ্চাটা যখন আমাকে দেখে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করল , আমার আবু কই চাচ্ছ ? আমার বুকের ভেতরটা কেমন জানি মোচড় দিয়ে উঠল। আমি আর থাকতে পারলাম না। বাসায় চলে আসলাম।

তার আরো কয়েকদিন পর , ম্যাডাম যখন একটুখানি স্বাভাবিক হওয়া শুরু করলেন, তখন মাঝে মাঝে , মানে সপ্তাহ দশদিন পরপর ম্যাডামের বাসায় যেতাম। এটা সেটা খোঁজ খবর নিতাম। ম্যাডামও মাঝে মাঝে আমাকে দিয়ে বিভিন্ন নিত্য ব্যবহার্য জিনিস আনিয়ে নিত। এভাবে আমাদের যোগাযোগটা যখন বেশ বেড়ে যাচ্ছিল তখনই আমি স্বপ্নটা দেখলাম। ভয়াবহ রকমের মন খারাপ করা স্বপ্ন। দেখলাম কেউ একজন আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে ম্যাডামের কাছে আমার সব দোষ স্বীকার করতে। যদি না করি তবে ম্যাডাম এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যাবেন।

স্বাভাবিক মানুষ মাত্রই এ স্বপ্নের কথা হেসে উড়িয়ে দিবে জানি। কিন্তু আমি তো সাধারণ কেউ না। ব্ল্যাক ম্যাজিকে বিশ্বাসী। জগতটাইতো সৃষ্টিকর্তার ক্ষণিকের একটা জাদু। জগতের সবকিছুই সম্ভব ম্যাজিক দ্বারা। একজন ম্যাজিশিয়ান হিসেবে স্বপ্নের প্রতি রয়েছে আমার অগাধ বিশ্বাস। এই স্বপ্নের জোরেই তো আমি যখন ইচ্ছে কাছে পেতাম আমার সবচাইতে প্রিয় মানুষটাকে। তাই আমি চরম উভয় সংকটে ছিলাম এই ছয়দিন। এই লেখাটা লিখতে বসার একটু আগেই সিদ্ধান্ত নিলাম ম্যাডামের কাছে সবকিছু স্বীকার করব। আফটার অল , ম্যাডাম বেঁচে থাকলে (ম্যাডামের সাথে যোগাযোগ থাক বা না থাক) আমি ম্যাডামের সৌন্দর্যটাতো দূর থেকে হলেও দেখতে পাব। ম্যাডামের সামনে গিয়ে এসব কথা বলার সৎ সাহসটা আমার নাই ।

মুঠো ডরা বোদ



তাই আমি আজ এই গল্পটা লিখে বাংলা একটা ব্লগে প্রকাশ করব। আমি জানি ম্যাডাম একজন নিয়মিত ব্লগার। তারপর ম্যাডামকে কল করে বলব লেখাটা পড়ে নিতে। আজই যেহেতু শেষ দিন কাজটি আজকেই করতে হবে।

ম্যাডাম, আমি জানি আমি যে অপরাধ করেছি তা ক্ষমার অযোগ্য। আমাকে ক্ষমা করতে হবে না ম্যাডাম। চাইলে আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়েও দিতে পারেন। কেবল প্রার্থনা এটুকুই , আপনি ভাল থাকেন। শরীরের প্রতি যত্ন নিবেন। আর অমন মনমরা হয়ে থাকবেন না। আপনার মুখে কেবল হাসিটাই মানায়। ভাল থাকবেন। আপনাকে অনেক ভালবাসি।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই রাজু ব্লগ খুলে বসল। উদ্দেশ্য ম্যাডামের প্রতিক্রিয়া বুঝার চেষ্টা করা। ব্লগ খুলেই রাজু দেখতে পেল ম্যাডাম লিখেছেন , তোমার লেখার হাত ভাল। সুন্দর লিখেছ। হ্যাপি ব্লগিং।

কায়েস শামী

ই-মেইলঃ [kais\\_shami777bd@yahoo.com](mailto:kais_shami777bd@yahoo.com)

মুঠো ডরা বোদ

## আবির্ভাব

আসমানের ঐ তারার দেশে ছিলে তুমি রানীর বেশে  
মর্মে কেনো মরতে এলে প্রিয়;  
আমার এ প্রেম তোমার তরে লুটিয়ে দিলেম উজাড় করে  
বন্ধু ভেবে আপন করে নিও।

এসেছিলে শ্যাম-বালিকা গলে পড়ে ফুল-মালিকা  
চরনখানি আলতো করে ফেলে,  
রক্ত-মাখা গোলাপ তুলে পরিয়ে দিলেম তোমার চুলে  
দেখলে তুমি তোমার নয়ান খুলে।

রাগ ছিলো কি তোমার চোখে প্রেম ছিলো কি তোমার বুকে  
অবোধ আমি বুঝতে পারিনি;  
ভয়ে ভয়ে দূরে থেকে শুধু তোমার ছবি ঐকে  
পার করেছি হাজার রজনী।

সেই যে তুমি রানীর বেশে চলে গেলে দূরের দেশে  
ভীনদেশী এক রাজপুত্রের সনে,  
অশ্রুজলে বুক ভেসেছে তাইনা দেখে সব হেসেছে  
লজ্জায় আমি লুকিয়ে গেছি বনে।

আবার কেনো আসলে রানী অধরেতে মধুর বাণী  
ভাঙ্গা-হৃদে আলতো ছোঁয়া দিয়ে;  
বুকের ভেতর ভয় তরাসে কিভাবে যাই তোমার কাছে  
সব হারানো হৃদয়খানি নিয়ে।

কেমন করে বাঁজাও বাঁশি সুর যেনো গো সর্বনাশী  
থাকতে আমায় দেয়না গৃহ কোনে,  
ওঝা যেমন বীনের টানে গর্ত থেকে সর্প আনে  
তেমনি করে টানছো তোমার পানে।

মুঠো ডরা বোদ



লজ্জা-শরম সকল ভুলে      আমার 'আমি' তোমার কোলে  
রাখবো কেমন করে তুমি বলো?  
আমার 'আমি' নেইকো আমার হৃদয় জুড়ে দুখের পাহাড়  
সুখের ছোঁয়ায় করছে টলোমলো।

আমরা এখন যেমন আছি হৃদয় নিয়ে কাছাকাছি  
সুখভনিতায় দুঃখ নিয়ে মনে,  
আমাদেরই এই পিরিতি      অমর বাণীর হোক না গীতি  
মিশে গেলে সোঁদা মাটির সনে।

তোমার আমার মিলন মেলা      তোমার আমার রঙ্গ খেলা  
নাইবা হলো এই পৃথিবীর 'পরে';  
আমার সকল চিন্তা কাজে      তোমার কথা নিত্য বাজে ,  
আমার হৃদয় রাখি তোমার তরে।

সকল ব্যথার সকল সুখের      সকল আশার সকল দুখের  
মধ্যমনি তুমি আমার প্রিয়,  
দূর থেকে এই শব্দাবলী      তোমার পায়ে দিলাম ঢালি  
রক্ত-ঝরা ভালোবাসা নিও।

মুঠো ডরা বোদ

## দুঃখবোধের সরলতা

দুঃখবোধের সরলতা কলমের নিবে ঝরে পড়ে;  
 যেনো পাহাড়ের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কান্না তার -  
 ঝরনার ছলে অবিরাম গড়িয়ে যায়- নিয়তই;  
 আমাদের প্রতিদিনকার প্রগাঢ় ভালোবাসাগুলো  
 মৃত সারসীর ন্যায় মুখ খুবড়ে পড়ে রয় অবিন্যস্ত -  
 জলাঙ্গীর চেউয়ে আছড়ে পড়ে ফেনায়িত মুখ তার;  
 স্বপ্নগুলো ক্রমশঃই অপসূয়মান কুয়াশার শরীরে  
 যেমন ঢেকে যায় শর্ষে ক্ষেতের তীক্ষ্ণ হলুদ তাণ্ডব।

কবে, মনে পড়ে ? কোন এক বসন্ত-রাতের দ্বিপ্রহরে -  
 চৈতালী চাঁদনী মায়ার জাল ছড়িয়েছিলো এক স্বপ্ন;  
 পরস্পর হাত ধরাধরি করে ধীর পদলয়ে চলেছি আমরা  
 অজানা সীমান্ত-রেখাকে লক্ষ্য করে - তুমি আর আমি;  
 কখন যে ছুটে গেলো হাতের বন্ধন কেউ পাইনিকো টের  
 আজ দু'জনের বসবাস একই গ্রহের বিপরীত মেরুতে।

কবীর হুমায়ুন

ই-মেইল: [kabirhumayun6061@gmail.com](mailto:kabirhumayun6061@gmail.com)

মুঠো ডরা বোদ



## বেঙ্গমা বেঙ্গমী এবং ব্যাণ্ডার্জমের গল্প

বেঙ্গমা এবং বেঙ্গমী দম্পতির মধ্যে প্রণয়ের কোন অভাব না থাকলেও তাদের একটা বড় দুঃখ ছিলো। তারা নিঃসন্তান। অবশ্য এক্ষেত্রে ভালোবাসার অপ্রতুল প্রায়োগিকতাকেও দায়ী করা যায়। কারণ তারা থাকতো দুটি আলাদা বৃক্ষে। মিলিত হবার সুযোগ পেতো কম। বৃক্ষশোভিত এই অঞ্চলে অরণ্যের বিস্তারের সাথে সাথে তাদের মধ্যে দূরত্বও বাড়তে থাকে। একসময় তারা আবিষ্কার করে, বাসস্থান এবং বাস্তুসংস্থানের বিবর্তনে তাদের মধ্যে একটা বিভাজনরেখা তৈরী হয়েছে। তখন তারা বাস্তুবতাকে মেনে নিয়ে যাবতীয় খুনসুটি স্থগিত রেখে নিজেদের নতুন দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কাজের ফাঁকে সময় পেলে সীমান্তের দুই পাড় থেকে নিজেদের মধ্যে ভাবোদ্রেককারী কথোপকথনের মাধ্যমে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করত। তবে প্রায়শঃই কথাবার্তা রোমান্টিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পেশাদার সংলাপে পর্যবসিত হত। দুই পাশের আরণ্যিক আয়রনি তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কখনও কখনও নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরী করলে বুদ্ধিমান বেঙ্গমা চতুরতার সাথে মীমাংসা করে ফেলতো। এই যেমন, অরণ্যের বেঙ্গমীপ্রান্ত থেকে নিরামিশাষী প্রাণীরা সীমান্ত পেরিয়ে বেঙ্গমা অধ্যুষিত এলাকায় ঘাস খেতে গেলে অথবা সমগোত্রীয় কোন প্রাণীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে চাইলে স্থাপদসঙ্কুল অরণ্যের মাংসাশী পশুদের হামলার শিকার হত। এ নিয়ে বেঙ্গমীর তেমন কোন মাথাব্যথা না থাকলেও তার অধীনস্থ চতুষ্পদদের প্রতিবাদে মাঝেমাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ঘা প্রকাশ করত বাধ্য হয়ে। তবে তাদের প্রেমজ সম্পর্ককে কখনও এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ছাপিয়ে যেতে পারে নি। বরঙ তারা ভাবছিলো কীভাবে প্রেমজ সম্পর্ককে কামজে পরিণত করে সন্তান জন্মদান করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বেঙ্গমা একটি শর্ত আরোপ করেছিলো। সন্তানের ভরণপোষণ এবং অন্যান্য কোন দায়ভার সে নিতে পারবে না। প্রেমাকুল বেঙ্গমী এতেই তুষ্ট হয়ে গর্ভধারণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। তার অরণ্যের তৃণভোজী প্রাণীদের কেউ কেউ এতে

মুঠো ডরা বোদ

ব্যঙ্গের হাসি হেসে বক্রোক্তি করলেও মাতৃত্বের বাসনায় ব্যাকুল বেঙ্গমী এতে ভ্রক্ষেপ করে নি। দুর্দমগতিতে এগিয়ে চলছিলো তাদের প্রণোয়োপাখ্যান।

ইতোমধ্যে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে নিজ নিজ এলাকায়। ক্ষমতার চেকনাইয়ে বিষন্ন বেঙ্গমীর না হাসি মুখ হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বেঙ্গমাও হয়ে উঠেছে পরাক্রমশালী এবং মনমোহন। দুই অরণ্যের প্রাণীবৈচিত্রেও স্বকীয়তা প্রকাশ পেতে শুরু করল।

একপাশে নিরীহ তৃণভোজীদের দল। অন্যপাশে হিংস্র স্থাপদেরা। তৃণভোজীরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে অন্য অরণ্যে অনধিকার প্রবেশের ফলে হিংস্র নখ এবং দাঁতের চিহ্ন বয়ে বেড়াতে থাকলো, কেউ কেউ সেখানেই মৃত্যুবরণ করল। আর জাঁদরেল বেঙ্গমাবাহিনী মাঝেমধ্যে তদারকির ছলে নির্বিঘ্নে অপরপ্রান্তে গিয়ে সমুদয় জৈবিক কাজকর্ম মেটাতে থাকলো। এহেন বৈপরীত্যময় আচরণে বেঙ্গমীপ্রান্তের প্রাণীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিলেও ধুরন্ধর বেঙ্গমার হস্তক্ষেপে একপক্ষীয় শান্তিপূর্ণ সংলাপ অনুষ্ঠান শেষে সবকিছু আবার স্বাভাবিকভাবেই চলতে লাগলো।

বেঙ্গমীর মনে আজ অনেক সুখ। আজ সে বেঙ্গমার অনেক কাছাকাছি এসেছিলো। স্পর্শজনিত শিহরণে এখনও তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। বেঙ্গমা একজন যথার্থ বীরপুঙ্গব বটে। সীমান্তের বেড়াজালের সে নিকুচি করে। প্রতিবাদী তৃণভোজী চতুষ্পদদের অবজ্ঞা করে সদম্ভে এগিয়ে এসে হাত ধরেছিলো বেঙ্গমীর। প্রেমাতাল বেঙ্গমী এই শুভমিলনের আয়োজন অনেক আগেই সেরে রেখেছিলো। বেঙ্গমা এবং তার নখবাহিনীকে আপ্যায়ন করতে অরণ্যের সবচেয়ে সুপেয় জলাশয়ের সুমিষ্ট মাছ উপহার দিয়েছে বোঝাই করে। এই সামান্য উপহারে সে সন্তুষ্ট হবে কী না তা নিয়ে অবশ্য যথেষ্ট

মুঠো ডরা বোদ



কুণ্ঠিত ছিলো। বেঙ্গমার ক্ষুধা যে অনেক বেশি! সে তা প্রকাশও করেছে আরো কিছু উপহার দাবী করে। জলাশয়ের মৎসকূল ভোজনের জন্যে পর্যাপ্ত, কিন্তু তার অরণ্যানীর সবুজতা ক্রমশ বিলীন হয়ে আসার প্রেক্ষিতে সে পুরো জলাশয়টাই দাবী করে বসে। এত বড় উপটোকন দিতে বেঙ্গমীর কোন আপত্তি ছিলো না, শুধু নির্বোধ তৃণভোজীগুলো হাঙ্গামা না বাঁধালেই হয়। এরকম আবদার আসতে পারে এবং এর ফলশ্রুতিতে কী কী বিপত্তি হতে পারে তা নিয়ে পূর্ব পরিকল্পনা থাকায় এবং সে মোতাবেক অনুগত বাহিনী প্রস্তুত ছিলো বলে ব্যাপারটা খুব সহজেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। অনুচরেরা অরণ্যের সকল বৃক্ষের পাতায়, বাকলে, কাণ্ডে পানিবন্টনের উপকারিতা লিখতে থাকে।

-তুমি কি সন্তুষ্ট প্রিয়তম?

প্রেমাবেগে সুধোয় বেঙ্গমী।

-তোমাকে কাছে পেতে আমার যে আরো অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে এখনও! আমি আরো চাই। বল দেবে না?

-কী চাও বল? আমি সব প্রতিবন্ধকতাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব।

-এইতো ভালো মেয়ে! তুমি তো জানো, সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় এবং তোমার সহযোগিতায় আমাদের বনের আধুনিকায়ন হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে অনেক। সীমান্ত রক্ষাকারী স্থাপদদের দাঁত এবং নখ আরো ক্ষুরধার হয়েছে। আমাদের প্রধান রপ্তানীযোগ্য পণ্য মাকাল ফল তোমাদের দেশে রপ্তানী করে প্রাণীকুলকে নেশাবিষ্ট করা গেছে। তারা এখন নিজ অরণ্যের উৎপাদনশীলতাকে তোয়াক্কা না করে আমাদের সরবরাহকৃত মাকাল ফল খায় তিনবেলা। সেই ফলের ছিলকা টাঙিয়ে রাখে প্রাচীরপত্রের মত করে। আমাদের এখানকার প্রধান সঙগোষ্ঠী ব্যাঙেরা সেখানে নায়কের মর্যাদা পায়।

মুঠো ডরা বোদ

-হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই বলেছো, এখন সবাই ব্যাঙেদের ভাষা শিখে ফেলেছে। তাদের আচার আচরণও অনুকরণ করছে সুচারুভাবে। আর তোমাদের প্রেরিত ছিন্নবাকল সবাই পরিধান করছে শৈলীর প্রকাশ হিসেবে!

গদগদ কণ্ঠে বেঙ্গমী বলে।

-সবকিছুর জন্যে তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ, প্রিয়তমা! তবে আমি আরো আরো কাছে আসতে চাই।

কামজর্জরিত কণ্ঠ বেঙ্গমার। তার মনমোহন রূপ দেখে বেঙ্গমীও যৌনকাতর হয়।

-কী চাও তুমি বল!

কণ্ঠটা আরো মাদকতাময় করার জন্যে সে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে।

-শোনো ডার্লিং, তোমাদের অরণ্যে আগমন সহজ করার জন্যে আমাদের পরিবহন সুবিধা দিতে হবে। আমাদের যানবহনগুলো আগের চেয়ে ভারী হয়েছে। এখন তোমাদের সেই ছোট্ট গলিপথ দিয়ে প্রবেশ করতে বড়ই অসুবিধে হয়। জায়গাটা বাড়ানো যায় না? এতে অবশ্য তোমাদের অরণ্যের কিছু গাছপালা ধ্বংস হবে, তা সেজন্যে আমরা না হয় কিছু মাশুল দিয়ে দেবো।

-না, না কী যে বলেন! কোনরকম মাশুল দিতে হবে না। সেটা অভদ্রতা হবে।

বেঙ্গমার শেষের কথাগুলিতে অনিচ্ছার ছাপ পেয়ে তড়িঘড়ি করে বলে বেঙ্গমীর সন্তুষ্টি বিধানে নিয়োজিত একজন উপদেষ্টা। বেঙ্গমা এবং বেঙ্গমী পরস্পরের দিকে চেয়ে মধুর হাসি দেয়।

এসব কথাই ভাবছিলো সবচেয়ে বড়গাছের ডালে বসবাসকারী বেঙ্গমী। আবেগে কখনও তার চোখে জল আসছিলো, কখনও বিরহ বেদনায় সে ডাক

মুঠো ডরা বোদ



ছেড়ে কাঁদছিলো। বেঙ্গমা যে আজো তার সাথে শুলো না! কবে তার গর্ভে ধারণ করবে তাদের সন্তান। অবশ্য সামনে শুভদিন। তাদের আরো কাছাকাছি আসার সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন। এই সুখকল্পনায় মজে থেকে সে সুখনিদ্রার আশায় চোখ বোঁজে।

রাতের এই সময়টা বন বেশ সরগরম থাকে। প্রতিবাদী গরু, নির্বোধ ছাগল, বিপ্লবী চোড়াসাপ, সবাই মিলে বিজাতীয় ভাষায় রচিত ওপাড় থেকে আসা ব্যাণ্ডেদের বিনোদনময় প্রদর্শনীতে মত্ত থাকে। ভাষাটা তারা বেশ ভালো রপ্ত করে নিয়েছে। নিজেদের ভাষার সাথে কিছুটা ব্যাঙভাষা যোগ না করলে নিজেদের ঠাঁট বজায় থাকে না। তারা প্রেম, বন্ধুত্ব, যৌনতা সহ পারস্পরিক সবরকম ভাব বিনিময়ের সময় ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করবেই। নিজেদের জনপ্রিয়তার সুযোগে ভিন্নারণ্যের ব্যাঙগুলো অবাধে যৌনাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে বিভিন্নরকম শঙ্কর প্রজাতির উদ্ভব হচ্ছে। তবে নব শঙ্কর প্রজন্মটি ব্যাঙভাষাতে আরো বেশি দক্ষ। এটা নিয়ে বনের কিছু পশুপাখি আপত্তি তুললেও কেউ আমলে নেয় না কথাগুলো।

তবে আজ সকালের পরিবেশটা ভিন্ন। দিনকয়েক আগে অরণ্যসীমান্তে একজন নিরীহ গরুকে সীমান্তে প্রহরারত স্থাপদের দল নির্মমভাবে অত্যাচার করেছে। তার জননঅঙ্গে ধুতরাফুলের বিষ মাখিয়ে দিয়েছে। এরকম ঘটনা অবশ্য আকছারই ঘটছে। সমস্যা বাঁধালো কিছু বৈদ্যমান ব্যাঙ সঙবাজী না করে এই ঘটনা অবলম্বনে একটি মর্মান্তিক এবং হৃদয়গ্রাহী নাটক মঞ্চস্থ করায়। সারা অরণ্যে টি টি পড়ে গেলো। তৃণভোজীরা খুরে শান দিতে লাগলো, চোড়া সাপেরা ফণা তোলার চেষ্টা করল। এতকিছুর দরকার পড়তো না, যদি না কিছু রাগী এবং ক্ষ্যাপা ষাড়ের দল শিং উঁচিয়ে জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখতো।

মুঠো ডরা বোদ

রাগী ষাড়েরা রক্তবর্ণ চোখে শিং উঁচিয়েই রাখে।

তৃণভোজীরা খুর ঘষতে ঘষতে ক্লান্ত হয়ে যায়।

চোড়াসাপেরা বিষদাঁত এবং ফণার অভাবে চরম মর্মযাতনায় ভুগতে থাকে।

এমতাবস্থায় বেঙ্গমীর সুখনিদ্রা ভঙ্গ হয়। সে উৎকর্ষিত হয়ে পড়ে মুহূর্মুহ  
শ্লোগানে,

"মাকাল ফল ক্রয় এবং বিপনন বন্ধ করো, বন্ধ করো!"

"ব্যাঙভাষার সঙচিত্র চলবে না, চলবে না"

ছিঃ! কী সব অসভ্য জানোয়ার। না জানি বেঙ্গমা কী ভাবছে! সেধে কেউ  
এভাবে বন্ধুত্ব বিসর্জন দিতে পারে! একটা ব্যবস্থা না নিলে চলছে না...

সন্ধ্যাবেলায় আবার জরুরী বৈঠকে বসে তারা। বেঙ্গমার মুখ খমখমে। বেঙ্গমী  
মরমে মরে যায় প্রায়!

-আমি খুব দুঃখিত প্রিয়তম তোমাকে অসময়ে ডাকার জন্যে। জানি খুব  
বিরক্ত হয়েছো, কিন্তু দেখছোইতো অবস্থা। উজবুকগুলো যা তান্ডব শুরু  
করেছে না!

মুঠো ডরা বোদ



-হু!!

-আমার বিশ্বস্ত অনুচরেরা অবশ্য প্রজ্ঞাপন চালাতে যথেষ্ট প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে। তারা প্রচার করা শুরু করেছে সীমান্ত ঘটনায় উৎকণ্ঠিত হবার কিছু নেই।

-আমি সত্যিই খুব আশাহত।

-তুমি কী আমাতে উপগত হবে না? আমি যে সেই মহাশয়ের জন্যে অপেক্ষা করে আছি!

-এটা নিয়ে এত অস্থিরতার কিছু নেই প্রিয়তমা! বয়সবৃদ্ধির সাথে সাথে আমার মাঝে যৌনতা সম্পর্কিত নতুন দার্শনিকবোধের উৎপত্তি ঘটেছে। এই যে তোমার সাথে আমার সরাসরি শারীরিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু তাতে কী হয়েছে! আমার প্রেরিত সঙব্যাঙেরা তোমার অরণ্যের সবার ওপর উপগত হচ্ছে, বংশবিস্তার করছে। এতেই আমি প্রায় অর্গাজমসুলভ আনন্দ পাই। আমার অরণ্যের মাকাল ফলেরা ওখানে গিয়ে বৃক্ষে পরিণত হচ্ছে। এতেও আমি আনন্দ পাই।

-কিন্তু আমি যে আরো চাই!

-আচ্ছা, এই মুহূর্তে আমার পক্ষে যৌনকর্ম সম্পন্ন করার সময় নেই। তোমার জন্যে আমি বিশেষ একটি ব্যাঙের ব্যবস্থা করেছি। আশা করি সে তোমাকে অন্তত আগামী দুই বছর তৃপ্তি দিবে।

বিশাল একটি গেছোব্যাঙ গছিয়ে দিয়ে কোনরকম ভালোবাসার সম্ভাষণ ব্যাতিরেকেই স্থানত্যাগ করে ব্যাঙ্গমা।

গেছোব্যাঙটি একলাফে বেঙ্গমীর বাসস্থান-অরণ্যের উচ্চতম গাছটির মগডালে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। বেঙ্গমীর চোখ ফেটে জল আসলেও সে বিশাল

মুঠো ডরা বোদ

গেছোব্যাঙটির কাছে যায়। অভিজ্ঞ কামপটু ব্যাঙটি কিছুক্ষণ শৃঙ্খার করে  
বেঙ্গমীর যৌনেন্দ্রীয়কে সিত্ত করে তোলে।

সেসময়ও উত্তাল শ্লোগান চলছিলো অরণ্যে,

"মাকাল ফল ত্রয় এবং বিপনন বন্ধ করো, বন্ধ করো!"

"ব্যাঙভাষার সঙচিত্র চলবে না, চলবে না"

কামলীলায় বাধা পড়ায় বেঙ্গমী বিরক্ত হয়। পরক্ষণেই প্রফুল্ল হয় তার  
নিয়োজিত অনুচরের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য প্রকাশ পেলে।

"ধর্ষণ যখন অনিবার্য, তা উপভোগ করাই শ্রেয়"।

সব দ্বিধা ছুড়ে ফেলে বেঙ্গমী তার যোনী মেলে ধরে।

হাসান মাহবুব

ই-মেইলঃ shobuzshomoy@yahoo.com.hk

মুঠো ডরা বোদ



## ভালোবাসার অন্বেষণ

ভালোবাসার রঙ কি  
আমি কখনো দেখিনি

ভালোবাসা কি নীল  
নীল আকাশে ভেসে বেড়ানো  
সাদা মেঘের ভেলা

নাকি লাল  
পশ্চিমাকাশে ডুবে যাওয়া  
সূর্যের মতো লাল

ভালোবাসা কি সবুজ  
নিবিড় প্রকৃতির মতো  
যেখানে গাছেরা সারি সারি  
গড়ে তোলে গভীর মিতালী

ভালোবাসা কি সাদা  
কাশবনের শুভ্র সাদা ফুল

ভালোবাসা কি হলুদ  
শীতের সরষে ক্ষেত

নাকি ফাগুনে  
বনে আগুনরাঙা পলাশ

ভালোবাসা কি কাল  
রাতের আধারের মতো  
নাকি প্রভাতের  
সিঙ্ক আলো

প্রথম ওঠা সূর্যের আলো  
নাকি ডুবে যাওয়া সূর্য

জানি না জানি না  
ভালোবাসার রঙ কি.....

মনে হয় প্রজাপতির মতো  
মুক্ত হাওয়ায় খেলে বেড়ানো  
কিংবা কোন মুক্ত বিহঙ্গের  
মতন  
খোলা আকাশে  
ডানা মেলে ভেসে বেড়ানো  
ইচ্ছে মতন।

নীল কষ্ট

মুঠো ডরা বোদ

## কেমন আছো?

কেমন ছিলে আমায় ছাড়া এতটা দিন? জানতে আমার ইচ্ছে ছিল  
এখানে বিকেল হলেই ঐ আকাশে ডানা মেলে চিল উড়ে যায়  
সন্ধ্যা বেলা ঐ আকাশে লাল আধারী স্বপ্ন দেখায়  
তুমি ও কি তাদের মাঝেই আমায় খুঁজো?

আমার এই শরীরটাতে বর্ষা এলেই কষ্ট করে বৃষ্টি নামে  
আকাশ থেকে গড়িয়ে পড়ে করুণা ধারা  
তুমি কি ঐ আকাশে তারার মাঝে আমায় খুঁজো?  
নাকি স্বপ্ন দেখে হটাৎ রাতে আঁতকে উঠে কোলবালিশে  
জড়িয়ে ধরে শব্দ খোঁজোশান্তি খোঁজো -?

আমি না হয় তোমার ছবি আঁকড়ে ধরে বুকের মাঝে  
কাটিয়ে দেব সব কোলাহল-  
জীবন যাবে থাকবে শুধুই মনের মাঝে -  
হারিয়ে যাওয়া লাল পেড়ে সেই শাড়ির আঁচল

এখন তুমি কেমন আছোজানতে বড় ইচ্ছে ছিল-

সবাই বলে ভালবেসে ভুল করেছি ভুল করেছি  
আমি জানি তোমার হাতে সেই বিকেলে মন দিয়েছি  
এখন আমি মনটাকে তাই খুঁজে বেড়াই  
মনটা শুধু তোমার কথা ভাবিয়ে আমায় আমায় কাঁদায়-

তুমি কি আমার মত আমায় ভেবে নষ্ট দিনে কষ্টে ভেজো?  
আমার মত মন হারিয়ে বুকের খাঁজে একলা একা স্বপ্ন খোঁজ -?

তুমি না হয় ভুলেই গেলে-এই আমাকে তোমার মাঝে-  
তবুও তোমার মাঝে কেমন আছে স্বপ্ন গুলো?  
এখন তুমি কেমন আছোজানতে বড় ইচ্ছে ছিল।। -

মুঠো ডরা বোদ



## কেমন আছো? - ২

ভাল আছি-

চিঠির আগে কোন সম্বোধন করলাম না জেনে নিও তোমাকেই - লিখছি।  
কত দিন তোমাকে দেখিনাকেনন আছো তুমি -? আমার মতই সুখে আছ  
নিশ্চয়ই। আমার এখানে যে কত সুখ সব -চাকর চাকরানি -বাড়ি -গাড়ি -  
শুধু কিছু একটার অভাব -আছে বোধ করি আমি প্রতি সন্ধ্যায়। এখন ও কি  
সন্ধ্যা হলেই আকাশে চিল দেখা যায় তোমার উঠোন থেকে? ঐ চিল কত  
স্বাধীন আমি -যদি চিল হতাম তাহলে ঐ আকাশ থেকে - এই মাটিকে  
দেখতামগ্রানাইটের-আমি এখন বারান্দা দিয়ে একচিলতে আকাশ দেখি - স্বপ্ন  
দেখে দেখে আমি ক্লান্ত রাজেনতুমি কি এখন ও সেই নীল আকাশে সন্ধ্যা -  
বেলা গোধূলীর রং গায়ে মাখো? জানিনা। হয়ত তুমি বদলে গেছ।

কতদিন আমি বৃষ্টিতে ভিজিনা . সে-দিন প্রথম বরষায় খুব ভিজতে ইচ্ছে -  
-করছিলো তুমি ও নিশ্চয় কারো হাতে হাত রেখে ভিজেছিলে গেয়েছিলে-  
-করুনাধারার গান যেভাবে আমার হাতে হাত রেখে গাইতে মনে আছে সেই -  
দিন গুলো? আমি ভুলিনিএখনো - মনের মাঝে হাহাকার করে সামনে স্বচ্ছ -  
আমি -তার পেছনে বৃষ্টি -গ্লেশিয়ার ভিজতে গিয়ে ও ভিজতে পারিনা পাছে -  
।।.১.কত কি -অসুখ বিশৃঙ্খ -ঠান্ডা লেগে যায়

জানও আমার একটা সোনার টুকরো ছেলে আছে ওর -আমার আদরের ধন -  
জন্মের সময় সবাই কি নাম দেবে জিজ্ঞেস করতেই কেন যেন মাথা থেকে  
রাজেন নামটা ফেলতেই পারলাম না-তাই ছেলেটার ও নাম রেখেছি রাজেন -  
দেখো বড় হয়ে ও তোমার মত কবিতা লিখবে- গান লিখবে ছোট্ট একটা নীল -  
এবং আমি সেই পরি কেই ঘরে -পড়ি কে ভালবাসবে তুলবো আমাদের স্বপ্নের -  
আমি ওকে -মত আমি ওর স্বপ্ন কে মরে যেতে দেবনা রাজেন দারিদ্র বুঝতে

মুঠো ডরা বোদ

দেবনাআমি ওকে শুধু ভালবাসা শেখাব। -

আজ তাহলে এখনেই থাকুক তুমি তো একটা ও চিঠি -দিলেনা হয়ত আমাকে -  
ভেবে কত কবিতা লিখে ফেলেছ আমাকে তোমার গান -লিখেছ কত গান -  
লেখার খাতাটা দেবে?- আমি ফেরত দেবপড়েই।-

আর বিশেষ কি-সুখে থেকো -ভাল থেকো -  
ইতিতোমার কৃত্তিকা। -

রাজিব চৌধুরী

ই-মেইলঃ [architect.rajib@gmail.com](mailto:architect.rajib@gmail.com)

মুঠো ডরা বোদ



## দ্বিধা

ছোটবেলা থেকেই আমি বেশ লাজুক। নিজের চাওয়াটা বা ইচ্ছেটা চেটিয়ে বলা তো দূরের কথা ফিসফিস করে বলতেও লজ্জা হত আমার।

প্রেমে পড়ার ক্ষেত্রে আমি ছিলাম আজব ধরনের আজ হয়ত নিশাতের প্রেমে পড়ে তার বাচ্চা-কাচ্চা বাবা হয়ে ঘরসংসার সাজিয়ে ফেলতাম দুদিন পরই আবার মুক্তা বা জেরিনকে নিশাতের আসনে বসিয়ে দিতাম। অথচ এতকিছুর পরও আমার নায়িকারা জানতই না আমার ভালোবাসার কথা!

কারণ? ঐ যে লজ্জা!

আমাদের কলেজের বেঞ্চগুলো ছিল অন্যরকম। ছেলে মেয়ে যে যেখানে ইচ্ছা বসতে পারত। মিতা আমার নজরে পরে গেল প্রথম সপ্তাহতেই। ওকে দেখে মনে হয়েছিল এই মেয়ে আমার না হলে ফাসি বা বিষ যায় একটা হোক না কেন আমার কোনো আপত্তি নেই। মিতার জন্য তখন আমি পাগলপ্রায়। খুব সকালে কলেজে এসে আমি বসে পরতাম তার পিছনের বেঞ্চোতার চুলের ঘ্রাণে ডুবে আমার পড়া কোথায় হারাত কে জানে। মাতাল আমি তখনও লাজুক। বলতে পারছি না কিছুই। অবশ্য মেয়েরা একটু বেশীই চালাক হয়। মিতা একদিন সরাসরিই জিজ্ঞেস করে ফেলল, তুমি কি চাও?

আমি আমতা আমতা করতে লাগলাম, কই কিছু না তো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, ভুল করো না।

গল্প উপন্যাসে হয়ত কলেজের ফাস্ট বয়ের প্রেমে পড়ে মেয়েরা। কিন্তু বাস্তবে নয়। আমি তখন শুনতে পেলাম মিতা আমাদের এক সিনিয়রের সাথে প্রেম করছে। মরীয়া আমি তখন ভুলটি করলাম।

মুঠো ডরা বোদ

কতক্ষন চুপ থেকে মিতা বলল , জীবনটা খুব কঠিন। তুমি ভুল করলেও আমি ভুল করতে পারি না। প্রাইভেট পড়িয়ে দিন যাবে না।

আমি কি খুব অপমানিত হয়েছিলাম ? মনে হয় না। কারন এর চেয়েও অনেক বড় অপমান আমাকে সহিতে হয়েছে জীবনে। মানুষের মন খুব অদ্ভুত। কিছু স্মৃতি সহজে ভুলা যায় না। অনেকটা ছোট মাছের কাটার মত। সহজে নড়ে না বরং বারবার তার বিরক্তিকর উপস্থিতি জানান দেয়। এ ঘটনার পর আমি অনেক অন্তর্মুখী হয়ে পরলাম। এর মাঝে আমি বুয়েট থেকে বের হলাম একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে। আমি মেয়ে মানুষ থেকে দূরে থাকি। ড্রিংক করি না কোনও পার্টিতে যায় না। আমার বউ আবার বিপরীত মেরুর। ওর সাথে আমার কিভাবে সম্পর্কটা টিকল তাই আমি বুঝি না। বুয়েট এর ছেলেরা হয় অনেক স্মার্ট। কিন্তু আমি সেই আগের মতই। আমার দশ বছরের ছেলের ভাষায় "গেয়ো" আর আট বছরের মেয়ের ভাষায় "ক্ষ্যাত"।

পাস করার পর বছর দুয়েক আমি একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি। তারপর নিজেই একটি ফার্ম খুলে বসি। সাফল্য ধরা দিতে আমার বেশী সময় লাগে নি।

আমি এখন আছি রহিমপুরে। আমার নতুন জুট মিলটার উদ্বোধন করতে বিকালে সাধারণত আমি চুপচাপ বসে থাকি। এ সময় কেউ আমাকে বিরক্ত করে না। কিন্তু আমার ম্যানেজার রাশেদ সামনে এসে দাড়িয়ে থাকতে অবাক হলাম আমি।

-কোনো সমস্যা?

-না স্যার... মানে এক ভদ্রলোক কয়েকদিন ধরে এ সময় দাড়িয়ে থাকে। আপনার সাথে দেখা করার জন্য।

-তো?

-স্যার উনি বলল আপনাকে তিনি চিনেন।

মুঠো ডরা বোদ



কতক্ষন চুপ থেকে বললাম, ঠিক আছে পাঠাও উনাকে।

নিজের চেহারার প্রতি আমার সবসময়ই হীনমন্যতা কাজ করে যদিও তবু বলতে বাধ্য হলাম লোকটি সুপুরুষ বটে! মধ্যবয়সে এসেও অনেক স্মার্ট। তবে পরিচ্ছদে দারিদ্রতার ছাপ স্পষ্ট।

বসতে বলে আমি বললাম, আপনাকে চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না।

মৃদ হেসে লোকটি বলল , স্যার আমি মিথ্যা বলেছিলাম আপনাকে আমি বা আমাকে আপনি চিনেন না।

তাহলে এভাবে দেখা করতে আসলেন কেন? আমার কণ্ঠে রাগ ফুটে উঠল।

-স্যার আপনি মিতাকে স্মরণ করতে পারেন? আপনার সাথে কলেজে পড়ত।

একটু বললে ভুল হবে বেশ চমক খেলাম আমি।

-আপনি....

আমাকে খামিয়ে দিয়ে লোকটি বলল, স্যার আমি মাহফুজ ওর হাসব্যাভ।

-আচ্ছা! সে কেমন আছে?

-ভাল স্যার।

-আপনি আমাকে স্যার ডাকছেন কেন?

-আসলে স্যার আমি আপনার কাছে সাহায্যপ্রার্থী। আমার একটা চাকরির খুব দরকার। তাই আপনার কাছে আসা।

আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। কতক্ষন চুপ থেকে বললাম , আসলে এই মুহুর্তে আমাদের কোনো লোক দরকার নেই তাছাড়া আপনি মিতার হাসব্যাভ আপনাকে তো যেখানে সেখানে বসানো যায় না।

-স্যার আমার কিছু একটা হলেই হবে। মিতা খুব আশা নিয়ে আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে।

মুঠো ডরা বোদ

চোখ বন্ধ আমার। ভাবছি আজ কি প্রত্যাখান করব নাকি মহত্ব দেখাব।

-স্যার আমি নাহয় মিতাকে আসতে বলি। দুপুরে তো আপনি রুমে একাই থাকেন। ঐসময়!

আমি চোখ মেলে সরাসরি উনার দিকে তাকালাম। চোখ নামিয়ে পা দিয়ে মাটি ঘষতে লাগল মাহফুজ সাহেব।

এ ধরনের প্রস্তাব পাওয়াতে আমি অভ্যস্থ কিন্তু নেওয়াতে নয়। কিন্তু আজ কি হল কে জানে। হয়ত কোনো খেলায় জয়ী হওয়ার নেশা চাপল মাথায়।

আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, ঠিক আছে ওকে আসতে বলুন। দুপুরে। একা।

আমার দিকে ঝুকে মাহফুজ সাহেব বলল, জ্বী স্যার। তাহলে আমি এখন উঠি।

চলন্ত মিতার বরকে দেখে কেন জানি আমার মনে হল লোকটি এ ধরনের প্রস্তাব দেওয়াতে অভ্যস্থ।

আমি সাধারণত ভোরের দিকে ঘুমাতে যাই। আজ সকালেও ঘুম আসছে না আমার। চাপা অস্থিরতা ফুটে উঠছে আমার শরীরে। সারাটা সকাল আমি পায়াচারি করে কাটালাম। খুব চেষ্টা করছি মিতার মুখটা চোখের সামনে ফুটাতে। পারছি না আমি। ঠিক বারোটায় দরজায় শব্দ হল। আমি জানি মিতাই এসেছে। এ সময় আর কারো আসার কথা নয়।

আমার পা কাপছে। শরীর ঘামছে। দরজা খুলতে পারছি না আমি। বুঝতে পারছি না আজ আমি কি হব। পাপী নাকি কাপুরুষ!

শুণ্য উপত্যকা

ই-মেইল: [zero19857@yahoo.com](mailto:zero19857@yahoo.com)

মুঠো ডরা বোদ



## সময়ে বদলে যাওয়া

- প্রেম করবি???

তুর্ঘর সরাসরি প্রশ্ন শুনে একটু খতমত খেয়ে যায় শিয়া। সামলে নিয়ে বলে -  
মজা করলি?

- মজা না আমি সিরিয়াস , মুখে একটা শয়তানি হাসি নিয়া বলে তুর্ঘ।

- তোর সিরিয়াসনেস আর কুকুরের সোজা লেন্জা দেখা এক কথা। পাল্টা  
একটা বিটকেলে হাসি ফেরত দেয় শিয়া।

- ধুর তুই এখনো দাদি রইয়া গেলি। সময় থাকতে নিজেই বদলা।

- হু বুচ্ছি , তোর মতো বাংলালিংক হইতে হইবো না আমার।

- যা ভাগ ,

বলে হাটা দেয় তুর্ঘ , চেয়ে থাকে শিয়া আর ভাবে এমন কেন রে তুই ??? তোরে  
কত ভালোবাসি তাইতো বুঝলি না কখনো। হয়তো বুঝিও না।

তুর্ঘ আর শিয়া অনেক ভালো বন্ধু। যদিও বন্ধুত্বটা হয়েছে তুর্ঘর স্কুলের ফ্রেন্ড  
তাশার মাধ্যমে। তাশা আবার ভালো করেই জানে তুর্ঘ কেমন ছেলে এখন  
যেমন জানে শিয়া। তুর্ঘর মতে সে কখনোই সিরিয়াস রিলেশনে জড়াবে না  
কারো সাথে। কাউকে ভালো লাগলে সরাসরি বলে প্রেমের কথা কিন্তু যখনই  
বলে সে সিরিয়াস না তখনই ঐ প্রেমের শেষ দেখা হয়ে যায়। তুর্ঘ কোনো  
মেয়ের সাথেই প্রেম করছে না কারন এই বোকার মতো সিরিয়াস না হওয়ার  
সিরিয়াসনেস।

মুঠো ডরা বোদ

শিয়া আর তুর্ঘর ২ বছরের বন্ধুত্বের শুরুর দিকেই তুর্ঘর প্রতি একটা টান অনুভব করে শিয়া। তুর্ঘটা অনেক বেশি বোকা। কলেজ লাইফের সেই প্রেমটার ব্রেকআপের কারনে প্রেমের ব্যাপারে সে তার চিন্তা ভাবনা চেন্স করে ফেলেছে। প্রেম করবে কিন্তু সিরিয়াস না। আর সে কতো বড় বোকা যে কাউকে ভালো লাগলে প্রেমের কথাও বলবে সাথে বলবে তার লক্ষ্যের কথা। আজব এই ভাবে বললে কি কেউ প্রেম তোর সাথে ??? এই কথাটা হাজারবার বলেছে সে তুর্ঘকে । কিন্তু কে শুনে কার কথা। কেন যেন নিজের ভালো লাগার কথাটাও বলতে পারে নি শিয়া আজও।

গত কয়েকদিন ধরেই তুর্ঘ শিয়ার পিছনে লেগেছে। শিয়া যতই বলে তোর মতো করে আমি প্রেম করতে চাই না ততই তুর্ঘ বলে তুই বোকা । আধুনিক হ। জীবনতো একটাই । হয়তো ঠিক বলছিস , ভাবে শিয়া।

মালচতে বসে আছে শিয়া , তুর্ঘর অপেক্ষায়। মাঝখানে তাদের মাঝে কেমন যেন একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। আজকে সেই তুর্ঘকে ডেকেছে ডিনার করবে একসাথে আর কিছু কথাও বলবে। তুর্ঘর খুব পছন্দের রেস্টুরেন্ট এটা , শুধু মাত্র এদের তান্দুরি চিকেনের জন্য।

অবশেষে তার সময় হলো আসার। আসতেই ফোড়ন কাটলো শিয়া

- কিরে কার সাথে ঘুইরা আসলি , এতো সময় লাগলো ???
- আছে কেউ একজন তবে তোর মতো দাদি-নানি না।
- হুম বুঝলাম ..... একটু গম্ভীর হয়ে যায় শিয়া

মুঠো ডরা বোদ



- এখন বল কি বলার জন্য এতো আদর আপ্যায়ন করে ডেকে আনলি ?? আর মুখটা এমন প্যাচার মতো হয়ে গেলো কেন??? প্রেমে পড়ছিস নাকি আমার ???

- পড়ি নাই এখনো তবে পড়বো বলে ডিসিশান নিছি।

- বাহ বাহ বাহ , তাইলেতো আজকে ফুল চিকেন চলবো।

- খা , তোরে না করছে কে??

- আচ্ছা যাই হোক এতো দিনে তোর মতি হইলো।

- হইছে অনেক আগেই। আচ্ছা যাই হোক তোরে যে জন্য আসতে বলছি। আমি ঠিক করছি প্রেম করবো তোর মতোই , মানে কোনো সিরিয়াসনেস থাকবে না।

- এইটাই তোরে এতোদিন বুঝাইতে চাইছি।

- থাম তুই । প্রেম আমি তোর মতোই করবো তবে অবশ্যই তোর সাথে না , অন্য কারো সাথে। যে প্রেমের কোনো ডেস্টিনেশন থাকবে না। কি বলিস , ঠিক করছি না??? বলে চেয়ে থাকে তু্যর দিকে।

- কথা বলবে কি তু্যর গলায় তখন ড্রিংকসটা আটকে গেছে ।

মেঘের দেশে

ই-মেইলঃ [trelochon@yahoo.com](mailto:trelochon@yahoo.com)

মুঠো ডরা বোদ

## এপিটাফের শেষ ছত্র

নিলীন কুহকের অন্তরালে , মহামায়ার কালো জোছনায় -  
বেঁচে থাকা এক নিশঙ্ক প্রাচীন জীবন ,  
নেমেসিসের নগ্ন দেহে একে দেয় ,  
ফিনিক্সের সোনালী নির্বাণ !  
পৃথিবীর শেষ মানবের লাশটাও তখন  
ছিড়ে খায় শকুনের ধূসর পালক !

নিশ্চল পাথুরে দেবীর রঙিন নখে আকা  
সোনালী ফিঙ্গের ঠাঁটে -  
ঝুলে থাকা বিশাল বটবৃক্ষ , মুছে যায় !  
হাওয়ায় ভেসে আসে এপিটাফের শেষ ছত্র -  
দেবী কামনার নয় , কামনা দেবীর !  
আহবের উর্ধ্ব প্রান্তে তাই ভীর , মানব খুলির !  
আরাধ্য অগ্নিতে জ্বলে উঠে কাফ্রার পাজর  
কাপালিকের হলুদ আস্তরণে ভ্রান্ত তার রূপ ।  
জলের মানব চেয়েছিল ছুতে একদিন  
দেবীর সুডৌল স্তনে !

কম্পিত কম্পন জাগে প্রোথিত অরণ্যে ।  
গোর দর্শনের পূর্বের উনসপ্ততিতম রাতে  
জলমানব হয় নিশ্চিহ্ন অচিন মৃত্যুরাণে !  
জাগরণের শেষ প্রান্তরে -  
দেবীর অবাক নৃত্য মূর্ছনায়  
ক্ষমাহীন অন্ধকারে জেগে উঠে নির্বাণ !  
থেমে যায় পৃথিবীর ঘূর্ণন ,  
মুছে যায় সব রূপকথার পৌরানিক ছন্দ  
নেমে আসে নরকের আদিম শয়তান ,  
বিষাক্ত জোছনায় ঘটে পার্থিব প্লাবন !

মুঠো ডরা বোদ



## আরণ্যক রাতেরা

বৈষ্মনিক রাত্রি জুড়ে নৈশব্দ কালো  
অলিক স্ট্রীটের অপার্থিব নির্জনতায় ,  
আচমকা নিভে গেছে সব আলো !  
তবু জেগে আছে বুভুক্ষ ল্যাম্পপোস্টেরা ,  
কিছু চৌরঙ্গীঘাট ,  
মধ্যনৈশতে সৃষ্টি করে -  
সোডিয়ামের আলোকবিভ্রাট ।

মৌমিতা , দেখ , সোডিয়াম রোদের  
এই বাদলের রাতে  
তোমার জন্য এনেছি চেয়ে -  
চারটি রঙ্গিন গোলাপ ,  
ম্যাপলের কতক পুরনো পৃষ্ঠা ,  
যেখানে পড়েছে কোন এক ,  
প্রাচীন কবির নিনাদ মায়াবী ছাপ ।  
সক্রিয় তাপযন্ত্রে তোমার রূপালি দেহ -  
শুকিয়ে যায় , তোমার সুডৌল বুক -  
যেন পাইনের মায়াবী জলে -  
বেঁচে থাকা এক অচিন পাখির  
শুভ্র লোহিত পালক !

আরণ্যক রাতেরা ছুপি ছুপি আসে ,  
মোমের ক্ষয়িষ্ণু শিখায় ধরে কাঁপন ,

মুঠো ডরা বোদ

তোমার আমার যৌগিক নিশ্বাসে !  
প্রতিলেপনে সৃষ্টি হয় বিষণ্ণ প্রলাপ ,  
মৌমিতা , দেখ -  
তোমার জন্য এনেছি চেয়ে -  
চারটি রঙ্গিন গোলাপ ।  
ধর্ষিত দেয়াল জুড়ে পেঁতুলামের দোলা ,  
হৃদয়ে তোমার -  
ধুসর কাচপোকারা করে খেলা !

তবু ভালোবাসলে না আমায় ,  
নিলে না গোলাপীয় নির্যাস !  
হয়তো তুমি আর মানুষ নও -  
মধ্যরাতের এক জৈবিক লাশ !

কবিশহিদুল

ই-মেইলঃ theshohidul@gmail.com

মুঠো ডরা বোদ



## আনিতার জন্য ভালবাসা

ছোড়দার চলে যাওয়া.....

আনিতার সাদামাটা জীবনে এতোদিন একমাত্র উপদ্রব ছিলো , ছোড়দার খুনসুটি। ছোড়দাও এখন আর অতবেশী জ্বালায়না। কয়েকদিনপর দেশের বাইরে চলে যাবে। তাই মন খারাপ করে বসে আছে। যেনো অগ্যস্ত যাত্রা! সবাই সারাদিন বোঝাচ্ছে , "আরে বাপু , এখনতো আর চিঠির যুগ না। টেলিমিডিয়ার এই যুগে দূরে গেলেও কি দূরে থাকা যায় ? বাটন টিপলেই কথা হয়ে গেলো। কম্পিউটারের মনিটরের সামনে বসলেই দেখা হয়ে যাচ্ছে। একেবারে সকালের আয়না দেখার মতো করে। " ছোড়দার মন তবু ভালো হয়না। মুখ কালো করে মায়ের কোলে মাথা রেখে বলে , "দেখবো ঠিকই, কিন্তু তোমাকে ছুঁতে পারবোনা। " মা মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। আনিতা ছোড়দার এই বিষন্ন ভাবের আরেকটা কারন আবিষ্কার করেছে। মৌমিতাদি। পাশের বাসার দিদি। ছোড়দার সাথে তার প্রেম। বাসার কেউ জানেনা। অথচ আনিতা জানে। সেদিন সুমীর সাথে কলাভবনের পাশে দাঁড়িয়ে চটপটি খাচ্ছিলো আনিতা। হঠাৎ দেখে , ছোড়দা আর মৌমিতাদি। রিকশায় করে কোথাও যাচ্ছিল। মৌমিতাদি বউদি হলে বেশ হয়। মৌমিতাদিকে বড় ভালো লাগে আনিতার। কত আদর করেন। আর কি সুন্দর হাসেন। এই কদিন স্কুল বন্ধ। বন্ধ মানে আর সব বছরের মত বন্ধ নয়। সামনে এস.এস.সি ফাইনাল। তার প্রস্তুতি চলছে। আনিতা এইবার এস.এস.সি দেবে। পড়াশুনা কিচ্ছু হচ্ছেনা। নির্ঘাত ফেল মারবে। তার মাথা ছোড়দার মত তুখোড় নয়। ছোড়দা কি সুন্দর স্কলারশিপ বাগিয়ে নিয়েছে। আজীবন ফার্স্ট বয় ছিলো। তার দ্বারা ওসব হবেনা। মা বলেন , ইন্টার পাস করলেই বিয়ে দিয়ে দিবেন। সেটা হলেই ভালো। আর পড়তে হবেনা। দুঃ! আনমনে লজ্জা পেলো আনিতা। এসব কি ভাবছে! ওই ছেলেটাই যত নষ্টের গোড়া। বাসা থেকে বেরুলেই পিছু নেয়। কোন জ্বালাতন করেনা। অনেক দূর থেকে শুধু তাকিয়ে থাকে। স্কুলের গেট পর্যন্ত গিয়ে আনিতা বহুবার পেছনে তাকিয়েছে।

মুঠো ডরা বোদ

নাহ, কোনদিন দেখা যায়নি। পিছু নিয়ে আবার কোনফাঁকে যে পালিয়ে যায় ,  
টের পাওয়া যায়না। পাগল একটা। ভুতের মতো করে আসে , আবার ভুতের  
মত করে ভ্যানিস হয়ে যায়।

ছোড়দা চলে গেলে বড্ড একা হয়ে যাবে, আনিতা।

এবং ভালোবাসা.....

ছোড়দা চলে যাওয়াতে ঘরটাকে বড় খালি খালি মনে হচ্ছে। এখন আনিতা  
চাইলেই চুলগুলো খোলা রেখে শান্তিতে পিঠে এলিয়ে দিতে পারে। ছোড়দার  
হঠাৎ এসে টেনে ধরার ভয়টুকু নেই। সন্ধ্যায় পড়া বাদ দিয়ে টিভিটা খুলে  
দেখলেও, কেউ এসে রিমোট কেড়ে নেবেনা। শাসন আর আদরের জায়গাটুকু  
অভিমান জায়গা করে নিয়েছে। কেনো গেলো! না গেলে কি হতো ? কি হবে,  
অতসব ছাইপাঁশ পাস করে! ছোড়দার উপর রাগ হয় আনিতার। কাল ফোন  
দিয়ে মার সাথে অনেকক্ষন কথা বলেছে । একবারও তাকে চায়নি। আনিতা  
কতবার মায়ের আশেপাশে ঘুরে এসেছে। মার কথাই যেনো শেষ হয়না।

তারপর গিয়ে দেখে মায়ের কথা বলা শেষ। মা ফোনটা টেবিলে রেখে কোথায়  
যেনো গিয়েছেন। ছোড়দা তাকে খোঁজেনি ! তাকে চায়নি! ফোনটাকে গালে  
লেপ্টে ছোড়দাকে অনুভব করার চেষ্টা করেছে আনিতা। ছোড়দাটা কি পাজী !  
আনিতা আশায় থেকেছে ওপাশ থেকে ছোড়দা বলবে , খুকি, রাগ করেছিস?  
না কেউ কিছু বলেনি। নিজের রুমে ফিরে এসে অনেকক্ষন কেঁদেছিল আনিতা।  
আজ বিকেলে নাসিম স্যারের কোচিং এ যেতে হবে। গতকয়েকদিন যাওয়া  
হয়নি। সকালে অর্পিতা ফোন দিয়েছিলো। আজ নাকি সাজেশন দিবেন স্যার।  
যারা আসবেনা, তাদের দেয়া হবেনা। দুপুরের পরে তাই আর ঘুমানো হয়নি।  
স্যারের কোচিং ৪.৩০ এ শুরু হবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে ৩.৪৭ বাজে।  
তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে বসে। রেডী হতে হবে। স্যারের বাসা বেশী  
দুরেনা। কাছেই। যেতে বেশীক্ষন লাগবেনা। বাসা থেকে বের হয়ে আনিতা  
রিকশা খুজছিলো। তাকিয়ে দেখে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে  
হাসলো। ছেলেটার হাসিটা বেশ। দেখতে ভালো লাগে। আনিতাও ভুল করে  
হেসে ফেললো! সর্বনাশ হয়ে গেলো! কি দরকার ছিলো হাসার! এখন কি  
হবে? ছেলেটা এগিয়ে আসছে। কি বলবে! বাসার কেউ যদি দেখে ফেলে! কি

মুঠো ডরা বোদ



হবে! নিজের উপর রাগ হলো আনিতার। ছেলেটা কাছে এসে বললো , "রিকশা খুঁজছেন? একটু সামনে এগিয়ে গেলে পাবেন।" আনিতা কোন উত্তর দিলোনা। সামনে এগোতে লাগলো। ছেলেটা বললো , " আমি আপনার সাথে যদি হাঁটি, রাগ করবেন?"

- "কেনো?"

- "এমনি।" বলে ছেলেটা আবার হাসলো। "আচ্ছা , ঠিক আছে। আপনি একাই হাঁটুন। আমি যাচ্ছি।" ছেলেটা চলে গেলো।

আনিতার মনে হলো , চলে না গেলেই ভালো হতো। আজকে না হয় হেঁটেই কোচিং এ যেতো। নিজের মনের ভাবনায় চমকে উঠলো আনিতা। এসবের মানে কি! সে কি ছেলেটাকে ভালোবাসতে শুরু করেছে! সমস্ত শরীর-মন ঝনঝন করে বেজে উঠলো আনিতার। ভালোবাসা!

ছেলেটা আর আসেনি.....

কোচিং থেকে ফিরে আনিতা সারাটা সন্ধ্যা বারান্দায় পেতে রাখা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলো। দৃষ্টি বারবার গলির মোড়ের ল্যাম্পপোস্ট ঘুরে এসেছোনাহ।নেই। আনিতার কান্না পেলো। ছেলেটা তার ফেরার পথে প্রতিদিন দাঁড়িয়ে থাকে। আজ ছিলোনা । নিশ্চই রাগ করেছে। করবেইতো। আনিতার কি দরকার ছিলো , অমন করে বলবার। মুখটাকে শক্ত করে কথা বলার। ছেলেটাতো অন্যায় কিছু বলেনি। শুধু একটু হাঁটতে চেয়েছে। নিজেকে বড় অহঙ্কারী মনে হলো ,আনিতার। মা চা খেতে ডাকছে । ধুর ইচ্ছে করেনা , চা খেতে। গেলোনা আনিতা।

- কি রে কতক্ষন ধরে ডাকছি। শুনিসনা? বারান্দা অন্ধকার করে বসে আছিস কেনো?

মা এসে বারান্দার লাইট জ্বলে দেন। দেখেন , আনিতা কাঁদছে।

-কি রে, কাদছিস কেনো? কি হলো,আবার!

মা কে দেখে আনিতা চমকে উঠে! কি বলবে! মাকে কিভাবে বলবে , সে কেনো কাঁদছে!

- ছোটনের কথা মনে পড়ছে বুঝি? পাগলি মেয়ে।

মুঠো ডরা বোদ

মায়ের কথায় খেই ফিরে পায় আনিতা। মা ভেবেছেন , ছোড়দার জন্য কাঁদছে।

-যাও, মা। আমি মুখ ধুয়ে আসছি।

নিজেকে সামলে নেয় আনিতা। বেসিনে দাঁড়িয়ে অনেশ্বন ধরে মুখ ধোয়। চায়।  
আয়নার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে , আর কখনো না। আর কখনো  
তোমাকে কষ্ট দেবোনা। কাল, তুমি আবার এসো। সারাটা বিকেল হাঁটবো।  
শুধু আমরা দুজন। কাল স্যারের কাছে যাবোনা।

দিনের পর দিন কেটে গেলো। কত পাতা ঝরার দিন গেলো। ছেলেটা আর  
আসেনি। আনিতার পিচ্ছি বাবুটা আজ বড় হচ্ছে। তবু ছেলেটার কথা মনে  
আছে, মনে পড়ে। ছেলেটাকে আর কখনোই দেখা যায়নি। কোথাও না।  
আনিতা, ভোলেনি ছেলেটা নিচ্ছয়ই ভুলে গেছে। মনে রাখেনি , আনিতাকে।  
মনে রাখেনি, আনিতার জন্য তার ভালোবাসা।

নিশাচর ভবঘুরে।

ই-মেইলঃ rakib.haider2012@yahoo.com

মুঠো ডরা বোদ



## হঠাৎ দেখা

দেখেছি তোমায় এই ভোরে

একটি চাদর গায়,

দূরী দলে হাটছো তুমি

নুপুর ছিল পায়।

ঠোট যেন রক্তজবা

হাসছে যেন পরী,

নতুন করে প্রতি ভোরে

তোমার প্রেমেই পড়ি।

(ছোট্ট এই স্কনটি মেয়েটির চোখে ছিল একদম অন্য রকম)

একটি ছেলে উদাসী এলোমেলো চুল,

পোলো শার্ট পরনে

উড়ছে চাদরের ঝুল।

কাঁধে ছিল বড় এক চার কোনা ঝোলা,

বোঝা যায় ছেলেটি

ভীষন আত্মভোলা।

আজ যখন হাঁটছিলাম

নুপুর ছিল পায়

ছেলেটি আমায় পাশ কাটালো চরম অবহেলায়।

তাসনুভা আখতার রিয়া

ই-মেইলঃ [lyana.tasnuva@ovi.com](mailto:lyana.tasnuva@ovi.com)

মুঠো ডরা বোদ

## পাগলামী নয়, ভালোবাসা!

- চল গুম হয়ে যাই!
- পালাবে?
- হুমা সব গুছিয়ে নাও। ৩ দিনের জন্যে চল যাই। চল চল।
- কি বল!! সপ্তাহ পরে আমার বিয়ে, আর তুমি বলছ...?!
- হ্যাঁ। নয়তো কি? তোমার তো বিয়ে হয়েই যাবে। তার আগে না হয় শেষ বারের মত আমার সাথে কাটালে!
- আমরা দুজন, একসাথে...
- হুমা একদম হাওয়া।

একটু ভেবেই আমি সায় জানিয়ে ফেললাম। একদম ঝাঁকের বসে।  
বড় অদ্ভুত আমাদের ভালোবাসা। আমাদের বলতে, আমরা দুজন। মুঞ্চ আর দীহা।  
যে দুজন একে অপরকে প্রানপনে ভালোবাসে। যে ভালোবাসার মধ্যে কোন ছেদ নেই, সামান্যতম খাদ নেই, যেখানে দুঃখেরা অচেনা। যে ভালোবাসা স্বর্গীয় পরশ দিয়ে ঢেকে রাখে আমাদের প্রতিটাক্ষনা। যে ভালোবাসায় আজ আমরা মাটিতে থেকেও আকাশে পাখা মেলতে শিখেছি। সেই আমাদের ভালোবাসা।  
দুইটি বছর আগে এমন পাগলামীর কাছে হেরেই মুঞ্চ 'র প্রেমে পড়েছিলাম আমি। আহসান মুঞ্চ। অদ্ভুত রকম ভাবে আমাকে তার ভালোবাসার জালে বন্দি করে ফেলেছিল। আর আমি ? মহানন্দে সেই ফাঁদে বাস করে চলেছি। একটিবারের জন্যেও আমাকে কোন আঘাত পেতে দেয়নি সে। আনন্দ আর উচ্ছাস এর স্রোতে ভেসে ভেসে আমি চলে এসেছি এতটাই দূর যে , নিশ্চিত মনে তার হাতটি ধরে পথে নেমে যেতে পারি।

কিন্তু, আজ অনেক কিছুই বদলে গেছে আমাদের। জীবনের তাগিদেই এগোতে এগোতে আজ আমরা বিচ্ছিন্ন হতে চলেছি , আমাদের এই অবুঝ প্রেম আজ বন্দিনী পাতালপুরে। সেই বন্দিত্ব থেকে সে যদি একটু ছাড়া পেতে চায় তবে আমি আর বাধা দেই কেন! তার উপর পরিবারের চাপে নিজেও বন্দি হতে যাচ্ছি বিয়ে নামক বুহুমুখী বাঁধনে। এইতো আমার উদ্যমতার শেষ অধ্যায়। তাই, চোখ কান বন্ধ করে, বাস্তবের কথা বস্তা বন্দি করে ফেলে রেখে বের হয়ে এলাম মুঞ্চ'র কথায়।

মুঠো ডরা বোদ



ওদিন পরে যেই মেয়ের গায়ে হলুদ ,সেই মেয়ে ঘর থেকে নিরুদ্দেশ হতে  
চলেছে।সমস্ত আয়োজন শেষ।দাওয়াত দেয়া থেকে শুরু করে ঘর  
সাজানো,নিজেকে গুছানো,কেনাকাটা করা ইত্যাদি সবই নিজে হাতে সেরেছি  
আম্মুর সাথে সাথে থেকে।কিন্তু আজ সেই আমি ভাগছি।প্রেমের টানে ভাগছি।

ব্যাগ এ বই খাতার বদলে ২সেট কাপড় ,আর কটা টুকিটাকি।ক্লাশ সেরে  
সোজা চলে এলাম শ্যমলী বাস স্ট্যান্ড এ । ওইতো,মুখ টাকে দেখা  
যাচ্ছে।হাতে কেবল একটা শপিং ব্যাগ।এটাই থাকার কথা।হঠাৎ যাত্রায় এত  
গুছগাছের কিছু থাকেনা। গুছগাছ করে সব নিয়ে তো আর গুম হওয়া  
যায়না!

ছোট্ট একটা দৌড় দিয়ে প্রায় ঝাপিয়ে পড়লাম ছেলেটার উপর।নিজেকে পুরো  
নির্ভর মনে হচ্ছে।মাথায় কিছু নেই।ভবিষ্যতের পায়ে অতীত কে বেধে  
উড়িয়ে দিয়ে এসেছি।আজ কেবল সামনে যা আসে তাই আমার সব ,তাই  
আমার জীবন।তাইতো সামনে মুখ দাঁড়িয়ে !ওর হাতে টিকিট।সিট বের করেই  
রেখেছে।উঠে পড়লাম। আমি বসলাম জানালার পাশে ,ও আমার ডানে।  
বিকেলের সোনালী আলো ঠিকরে পড়েছে।বাস ছেড়ে দিল ।গন্তব্য বান্দরবান।

-এই,ঘুম গেলে নাকি?

-আরে নাহ,আকাশটা দ্যাখ,কি সুন্দর হয়ে আছে!

-হুম,আকাশ পড়ে।আয়না আনছ?

অবাক হয়ে ফিরলাম তার দিকে।

-আয়না দিয়ে কি করবা? আনছি।

-বের কর,চেহারা দেখবো।

-ও হ্যালো!পাত্রী তোমার কাঁধে মাথা রেখে পড়ে আছে ,তুমি চেহারা দেখাবা  
কাকে?

-তোমার কি এক কোথায় কাজ করতে ভাল্লাগেনা?বের করনা!

বের করলাম আয়নাটা। সে সেটা খুলে আমার সামনে মেলে ধরল।

-কি?আমাকে দেখা যাচ্ছে!

-উহু,শুধু তোমাকে না গো। রোদের খেলাটা দেখেছো?

- কি? ...

মুঠো ডরা বোদ

অবাক হয়ে দেখলাম রোদের নরম আলোটা কেবল আমার আর ওর মুখের উপর পড়েছে। দুজনের মুখ দুটো থেকে যেন উচ্চাসের ছটা ঠিকরে পড়ছে, ভেতরে যে অব্যবহৃত সুখ খেলছে সেটার প্রতিচ্ছবি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। এইই ছিল আমাদের টুকটাক ভালোবাসাবাসি।

মোবাইলটা বের করে মেসেজ টাইপ করলাম , "চিন্তা করো না বাবা। ফিরে আসবো"। দু জনের মোবাইল থেকে একই লেখা পাঠিয়ে দিলাম ২বার। কাছোফোনের অফ মুড টা অন হয়ে গেল সাথে সাথে। একদম নেটওয়ার্কের বাইরে!!

তাকালাম মুঞ্চ 'র দিকে। ওর হাসি হাসি মুখটা দেখে ফিক করে হেসে ফেললাম। দুজনের মাথায় এক কথাই খেলছে। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে মেসেজের কথাটা বলতে গেলে সারাজীবন চেপ্টা করেও গলা থেকে বেরোত না যা, তাই লিখে ফেললাম! কত বড় সাহস!!

যাক, পড়ে রইলো সমস্ত পৃথিবী। আমি ডুব দিলাম মুঞ্চ 'র মাঝে। সে হারালো আমার মাঝে।

নামটা খুব সুন্দর। মিলনছড়ি রিসোর্ট। যেন সকলের মিলন স্থল। হা হা। ২৪৩নম্বর রুমটা আমাদের। কোন কলুষতা নেই আমাদের দুজনের মনে। বন্ধন টা যে খুব পবিত্রতা দিয়ে গড়া।

সারাটা দিন রাত পার হতে লাগলো হাতে হাত রেখে। চোখের গভীরে ডুব দিয়ে। আর, স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করে করে। এভাবে হারিয়ে যাওয়ার মাঝে যে কি রকম পুলক তা প্রত্যেকটা ক্ষনে আমি টের পাচ্ছি। কোনমতেই আনন্দ থামাতে পারছি না। বিনা কারনেই উৎফুল্ল। ইচ্ছে করছে সমস্ত টা পৃথিবী আমার পায়ের নিচে , আর আমি তাকধিনাধিন করে নেচে বেরাচ্ছি... দুজন দুজনের অস্তিত্ব কে নিংড়ে অনুভব করছি।

উড়ে চলে গেল ২টা দিন। ঠিক যেমন জিপ্সেলটির মতন-

মুঠো ডরা বোদ



"তুমি আমি আমি তুমি একই সুরে গাথা সারাফন ,  
আমি তুমি তুমি আমি একই মায়া ভরা তনু মন ,কাছাকাছি আছিইইই....."

বিশাল বড় বড় দুটো হাসি দুজনের মুখে।মুক্ত আকাশে নিজের ইচ্ছে মতন  
ভেসে বেড়ানোর তৃপ্তি মাথা সে হাসি আমাদের।নতুন করে নিজেকে ফিরে  
পাওয়ার সে হাসি।

ঢাকার বাসে উঠলাম।ওর কাঁধে মাথা রেখেই যাত্রা শেষ হল।

-এই শোন,ভালো থেকো।

পিছন ফিরে তাকলাম। ও আমাকে নামিয়ে দিয়েই সরে পড়ছে।শেষ দেখা  
দুজনের।আজ বিকেলে গায় হলুদ আমার।পরশু বিয়ে।

-হ্যাঁ।তুমিও,বলেই আর দাড়ানোর সাহসে কুলালো না।ঘরে পা রাখলাম।

আত্মীয় স্বজনে ঘর ভর্তি।যারা দেখলো এগিয়ে এল।আমি মা কে খুজছি।মনে  
উৎকণ্ঠা।চাচী এসে বলল,পিকনিক কেমন করলে?

ওহ!তাহলে ব্যপারটা বাবা সামলেছে!আস্তে করে সায় জানিয়ে আমার রুমে  
চলে এলাম।মা হলুদের ডালা গুছাচ্ছে।আমি চুপ করে বসলাম চোরের  
মতন।মা ভুত দেখার মতন চমকে উঠ তে যেয়েও সামলে নিল মানুষজনের  
জন্যে। বলল ,আসলি কখন! শিগগির উঠ।পার্লারে যাবি কখন!  
আমার মন তখন আর ঘরে নেই।অন্য কোথাও।হাতে আমার বিয়ের একটা  
কার্ড। উপরে লেখা,  
Mugdho weds Deeha.

স্বপ্নকথন

ইমেইল : [tasnuvad@yahoo.com](mailto:tasnuvad@yahoo.com)

মুঠো ডরা বোদ

## একটি পোড়া বাড়ি এবং আমরা ক'জন

জুমার নামায পড়ে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে বন্ধুরা গল্প করছিলাম , মসজিদে তখন ইমাম সাহেব পাপ পুণ্যের বয়ান করেই যাচ্ছেন। আমাদের উডু উডু মন কারোরই ওদিকে খেয়াল নেই। এরি মাঝে কেউ একজন বল্লো পাশের গ্রামে ক'দিন পূর্বে পুড়ে যাওয়া বাড়িটির কথা। একসাথে এতগুলো ঘর পুড়ে যাবার ঘটনা আশ পাশের গ্রামে প্রথম শোনা আমাদের এটুক বয়সে। কি মনে করে জানি বল্লাম , চল আমরা যে কয়জন আছি তাদের প্রত্যেকে ঘর থেকে কিছু সাহায্য নিয়ে ঘর হারা মানুষগুলোকে দিয়ে আসি। সবাই খুশি মনে রাজি।

আমরা যে যার ঘরে গিয়ে চাল আর টাকা যার যা সামর্থ আছে তা নিয়ে আসতে লাগলাম। পরে ভাবলাম এতগুলো ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেল , আর আমরা এত অল্প কিছু নিয়ে গিয়ে কাকে বাদ দিয়ে কাকে দেব ? ভাবনাটা সবারই মনটাকে নাড়া দিলো। সবারই সম্মতিতে আমাদের পাড়ার সব ক'টি ঘরে গিয়ে সাহায্য চাইবো স্থির করলাম। অবাক করার মতো কেউ না করলোনা, যার নুন আনতে পাছা ফুরায় অবস্থা সেও কিছুনা কিছু দিল। ঘরের মা চাচিরা কেউ কেউ পরামর্শ দিলো এ বলেযে , পুরোনো কাপড় চোপর থালাবাটি , কাঁচা তরিতরকারিও তোমরা নিতে পারো যদি কেউ দেয়। কারন সেই বাড়িতেতো সবই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

কিছুটা কেমন কেমন জানি করলেও প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে যে যাই দিচ্ছে তাই নিতে লাগলাম। পুরো বাড়ি ঘুরে এসে দেখি অনেক কিছুই পেলাম । আমাদের উৎসাহ বেড়ে গেল। পাশের বাড়িও গেলাম , এর পর তার পাশের বাড়ি। কেউ না করলোনা। সউৎসাহে যে যা পারলো দিলো। চাল , ডাল, টাকা, শাড়ি, ব্লাউজ, লুঙ্গি, শার্ট, থালা বাটি, তরকারি, ছোট বাচ্চাদের কাপড় , কেউ কেউ রান্নার জন্য তেল , মরিচ মশলা পর্যন্ত দিলো। আমাদের চেয়ে একটু বড় একটা মেয়ে কয়েকঘর ঘুরে কিসব একটা প্যাকেটে বন্ধ করে আমাকে দিয়ে বল্লো খবরদার খুলবিনা। সেটা শুনে আমার দুটা ক্লাসমেট দেখি ফিক ফিক করে হাসে। ধুর মরা তোদের রংতামাসা দেখার সময় নাই। কি দিবি দেয়রে বাবা। সব নিয়ে যাব। সব মিলিয়ে প্রায় ২০মণের মতো চাল , দুই বস্তা কাপড় , আরো অন্যান্য মিলিয়ে প্রায় আরো দুই বস্তা সামগ্রী। কল্পনার বাইরে। বন্ধুকে বল্লাম, আমাদের এসব সন্ধ্যার আগেই দিয়ে আসতে হবে। আর এত কিভাবে

মুঠো ডরা বোদ



নিয়ে যাবো আমরা। এসব ভাবতে দেখে দুই তিন পরিচিত রিক্সাওয়ালা নিজেই রাজি হয়ে গেল আমাদের এসব ফ্রিতে সেখানে দিয়ে আসতে।

নামায পড়েই দুপুরের খাবার খাওয়ার কথা। কোথায় আর খাওয়া দাওয়া , বেমালুম ভুলে গেলাম সে কথা। সমবয়সী এবং আরো কিছু পিচ্ছি পাচ্চাও জুটে গেল আমাদের সাথে। রিক্সায় তুলে দিলাম সামগ্রী আর আমরা হেট হেটে যেতে লাগলাম। মুখে এক আনন্দের তৃপ্তি। কোন ভাল কাজে হয়তো এমনই অনুভূত হয়।

গিয়েতো আমরা হতবাক। ওই পাড়ার একটা ঘরও বাকি নেই। সব পুড়ে ছাই। সবাই যে যার ভিটায় উন্মুক্ত আকাশের নীচে অসহায় বসে আছে। আমাদের দেখে কেউ মুখ তুলে তাকাবারও শক্তি যেন তাদের নেই। সর্বস্ব হারিয়ে তাদের শরীর মনের সব শক্তি যেন লোপ পেয়েছে। পুড়া বাড়ির একেকটা মানুষের মনো কষ্ট সেদিন দেখেছিলাম তাদের চোখে মুখে। কি ভয়ানক। বাড়ির শেষদিকটা থেকে এখনো চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। দুইটা নেঙটা পিচ্ছি চেঁচিয়ে উঠলো ”ওই আমগো লাইগা খাওন আনছে” ।

বাচ্ছাগুলোর চিৎকার আর এতগুলো পিচ্ছি পাচ্চা সহ আমাদের দেখে ও বাড়ির সব ছেলে মেয়ে এসে আমাদের ঘিরে ধরলো। এক বয়স্কজনকে ডেকে বললাম চাচ্চা আমরাতো জানতামনা এত কিছু। ভেবেছিলাম কয়েকটা ঘর হয়তো (পুড়েছে), আমরা ছেলেপুলেরা কিছু এনেছি , তাতো পর্যাপ্ত হবেনা মনে হয়। যাই হোক , আপনি এসব সবাইকে যেরূপ ভাল মনে করেন সেরকম করে দিয়ে দিন।

আমরা যে সারাদিন কিছু খাইনি সেটা কিভাবে জানি একজন টের পেয়ে গেল। হঠাৎ দেখি এক বয়স্কা মহিলা একটা পোড়া মগে করে পানি এনে আমাদের দিয়ে বল্লো - খা বাবারা। সবাই পানি খেলাম , উনার অন্তরের আশির্বাদ ছিলো হয়তো, আমাদের সারাদিনের ক্লান্তি যেন নিমিষিই দূর হয়ে গেল।

~মাইনাচ~

ই-মেইলঃ kaleempk11@yahoo.com

মুঠো ডরা বোদ



## প্যারিসের চিঠি ৩ - ছারপোকার পাখা নেই

ট্যাবের টপ টপ জলকেলিতে মুগ্ধ হওয়ার চাইতে  
অবাক হওয়ার ঘটনাই বেশী ঘটে ঠিক তখনি শীতের  
চাদর বিছানার উপরে পদ্মাসন নিয়ে বসে আর বিছানা  
আরামের ঘুমে রাত কাভার করে নেয়ার চিন্তায় বিভোর।  
ছারপোকা বাসা বাধে সমস্ত শরীরে, হেঁটে চলে। তখন  
শরীরে আগুন দিয়ে দেখা হয় ছারপোকার পাখা নেই,  
আলোতে দিকভ্রান্ত হয়ে শেষে নিজেরি মৃত্যু ডেকে আনে।  
আমরা পদ্মাসনে বসা চাদর মেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

## প্যারিসের চিঠি ৪ - অরণ্যের পথিক

পথটার দুপাশে সবুজ ঘাসেরা রেসিং ট্রাকের মত  
মাঝে সে জায়গাটুকু রেখেছে সেখানে প্রতিনিয়ত  
আমরা প্রতিযোগিতায় ব্যাস্ত। কিন্তু নিয়ম মোতাবেক  
আমাদের ভিষ্টরি লাইন কিংবা ফিতা নেই।  
আমরা নিরন্তর দিবারাত্রির প্রহসনে দৌড়ে যাচ্ছি  
জয় নিশ্চিত করার লোভে। আমরা ক্ষুধার্ত থাকি,  
থাকি পিপাসার্ত। রোদে ঘেমে দৌড়াই আবার  
বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি বাঁধিয়ে ভাবুক আনন্দে  
ব্ল্যাস্কেটের নীচে শুয়ে বলি-"হোয়াট এ লাইফ"  
শকুনি দুচোখে খুঁজে বেড়াই কাঙ্ক্ষিত লাল ফিতা।

মুঠো ডরা বোদ



## প্যারিসের চিঠি ৬ - স্বপ্নের কঙ্কাল

সাদামাটা স্বপ্নেরা রঙিন হওয়ার জন্যে বিদ্রোহ করে  
ট্রাফিক সিগন্যালের লাল, সবুজ, হলদে বাতির সাথে।  
স্বপ্নেরা রঙ চায়, আমাদের সমীপে অনশন করে রঙ  
ঢেলে দেবার দাবী জানায়। আমরা রঙ ঢালি না, যদি  
স্বপ্নেরা বাস্তবতাকে টপকে যায়! দিনে দিনে অনশনে  
থাকা স্বপ্ন আর স্বপ্নবাজের দল শুষ্ক হতে থাকে।  
আমরা স্বপ্নের হাড়িসার কঙ্কাল দেখে চমকে উঠি।  
তবুও আমরা রঙ দেই না, আমরা বাস্তবতাকেই  
মূল্যায়ন করে স্বপ্নের হাহাকারে কানে হাত দেই।  
আমাদের শহরের স্বনামধন্য গোরস্থানে শ্রদ্ধাভরে  
শেষকৃত্য হয় স্বপ্ন আর স্বপ্নবাজের দলের।

হাফিজুর রহমান রিক (রিয়েল ডেমন)

ই-মেইলঃ [realsrv@yahoo.com](mailto:realsrv@yahoo.com)

মুঠো ডরা বোদ

## সত্যি বলছি, তোকে খুব ভালোবাসি...

এখানে শব্দ অনেকটা কম মনে হচ্ছে। কানে একদমই লাগছে না। তাই না?

- হুম।

কি খাবি? আমি অর্ডার দিবো না তুই?

- আমি।

ওকে তুই তাহলে খাবারের অর্ডার দে, আমি এই ফাকে একটু বাইরে থেকে আসছি।

- কোথায়?

স্মোক করতে। এতক্ষন তোর জন্য তো স্মোক করতে পারলাম না।

- স্মোক না করলে কি হয়না?

না।

- ওকে যা, সময় মাত্র ৫মিনিট। এর মধ্যেই আসতে হবে।

ওকে। তুই বস, খাবারে অর্ডার দে, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।

এই বলে অলয় বেরিয়ে গেল।

অলয়ের সাথে রেস্টুরেন্টে খেতে আসা মেয়েটির নাম তিহা। খুবই শান্ত একটা মেয়ে। সম্পূর্ণ অলয়ের বিপরীত। এত শান্ত একটা মেয়ের সাথে ছনছাড়া অলয়ের পরিচয়টা কিন্তু অসাধারণ।

মুঠো ডরা বোদ



একদিন অলয় ও তার বন্ধু সুপ্তি রিকশা করে ক্লাসে যাচ্ছিল। যাওয়ার সময় অলয় সুপ্তিকে হাত নাড়িয়ে ইশারা দিয়ে দেখিয়ে বলে, “দেখ দেখ কত সুন্দর একটা মেয়ে। ঠিক যেনো আমার কবিতার নায়িকার মত লাগছে। দোস্ত, তুমি ক্লাসে যাও, আমি মেয়েটাকে ফলো করে একটু খোজ নিয়ে আসি”। এই বলে অলয় রিকশা থেকে নেমে যায় এবং তিহাকে খুব সাবধানে ফলো করে তিহার বাসা চিনে আসে।

পরেরদিন অলয় তিহাদের বাড়ির কিছু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তিহার সাথে কথা বলার জন্য। তিহা বের হওয়ার সাথে সাথে অলয় তার পিছু নেয় এবং হাটার গতিকে কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে তিহার সমকক্ষ হয় কথা বলার জন্য।

আমি অলয়। আপনাদের পাশের এলাকায় থাকি। এই এলাকায় আমার কিছু বন্ধুবান্ধব আছে তাই প্রায়ই আসা হয়। আপনি?

অলয়ের প্রশ্ন শুনে তিহা হাটার গতি থামিয়ে দিয়ে বলে, আমাকে কিছু বলছেন?

হ্যাঁ আপনাকেই।

- আমি তো অপরিচিত কারো সাথে কথা বলি না।

তাহলে আগে পরিচিত হয়ে নেই?

- না, আপনার সাথে পরিচিত হবো কেন?

কথা বলার জন্য।

- না, আমি একদিনের পরিচয়ে পরিচিত মানুষের সাথে কথা বলি না।

তাহলে আপনার সাথে কথা বলার জন্য আমাকে আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

অলয়ের এই কথা শুনে তিহার মুচকি হাসি দিয়ে বলল, আচ্ছা বলুন।

মুঠো ডরা বোদ

আমি অলয় আপনি?

- আমি তিহা।

সুন্দর নাম। তবে কোনো অর্থ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

- বুঝলেন কিভাবে?

মনে হল।

- ও তাই।

হুম।

- কি করা হয়?

পরিচালক।

- ছবি বানান নাকি?

হুম। তবে পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি না, স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি।

- ভালো তো। পড়াশুনা?

হুম সেটাও করা হয়। একটা বেসরকারী ভার্শিটিতে অনার্স করছি। ফাইনাল ইয়ার।

- তাহলে তো আপনি আমার থেকে এক বছরের সিনিয়র।

হুম জানি।

- কিভাবে জানলেন?

বন্ধুদের কাছ থেকে।

- আর কিছু জানেন না?

মুঠো ডরা বোদ



না।

- কেন?

আপনার কাছ থেকে জানবো বলে।

- এত মেয়ে থাকতে হঠাৎ আমার প্রতি জানার আগ্রহ কেন?

আপনি দেখতে আমার কবিতার নায়িকার মত। তাছাড়া আমি আপনার সাথে  
বন্ধুত্ব করতে চাই।

- কবিতাও লিখেন নাকি?

মাঝে মাঝে। শুনবেন?

- এই রাস্তায়? আচ্ছা তাহলে শোনান।

“স্বপ্নবালিকা, আজ তুমি সত্য।

নীলাস্বরের নীলাভ মেঘে চড়ে,

আজ তুমি আমার কাছে;

নীল গোলাপ, নও শান্ত নীলোৎপলা

তোমার চন্দ্র মুখায়বের শুভ্রাংশু,

আমায় করেছে বিমোহ।

তোমার আমার দূরতা,

আজ নিতান্তই নীয়া।

মুঠো ডরা বোদ

আজ তোমার প্রণয়ে আমি প্লাবিত।  
 চরিস্থ প্রেমাজল আজ স্থবির।  
 শূন্য অন্তরিন্দ্রিয় তোমার প্রেমে পূর্ণ।  
 ওগো প্রমদা, তুমি আমার মাঝে নামাক্ষিত।

নৈরাজ্যময় জীবনে তুমি দিয়েছো,  
 আকাজ্জার উজ্জল দীপ্তি।  
 তোমার ঐ পুলকিত আনন,  
 আমায় দিয়েছে, স্বর্গসুখের সম্যক তৃপ্তি।

আজ আমার প্রাণলভ্য,  
 শূন্যের কোঠায় নিমজ্জিত।  
 আমি নই হরুচন্দ্র প্রেমিক।  
 আমার প্রেম আর প্রেমধার আনন্ত্য।

ওগো স্বপ্নবালিকা,  
 আজ তুমি নৈসর্গিক সত্য।  
 মনোরাজ্যে করো অবাধ বিচরণ।  
 শুধু তুমিই আমার, প্রেমের প্রস্বাপনা”

মুঠো ডরা বোদ



কেমন হল?

- হুম ভালো?

বন্ধু হতে পেরেছি কি?

- কিছুটা। পরে আবার দেখা হলে পুরোপুরি হয়েছেন কিনা জানিয়ে দিব।

এইভাবে আর একবার নয়, অনেকবার দেখা হয়েছিল তিহার সাথে অলয়ের।  
আস্তে আস্তে তারা অনেক ভালো বন্ধুতে পরিনত হয়। তিহা তো সকালে চোখ  
খুলেই দেখে অলয়ের মেসেজ।

পাঁচ মিনিটের জায়গায় আধঘন্টা হয়ে গেলো অলয় এখনো আসছে না। অর্ডার  
করা খাবারগুলো ইতোমধ্যে চলে এসেছে। তিহা একটা খাবারও মুখে দেয় নি  
অলয়ের অপেক্ষায়।

নাহ! এভাবে আর বসে থাকা যায় না। অলয়কে একটা কল করা দরকার। এই  
ছেলেটার যে কবে বিবেক বুদ্ধি হবে আল্লাহই জানেন। একথা ওকথা ভেবে  
মোবাইলটা বের করে অলয়কে ফোন দিল তিহা। আজব তো মোবাইল অফ।  
নাহ! আজ এটার একটা জবাবদিহি করতে হবে। তিহা অর্ডার করা খাবারগুলো  
প্যাক করে দিতে বলল। খাবারগুলো নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিল তিহা।

রাত ১১টা। এখনো অলয়ের মোবাইল বন্ধ। সুপ্তিকে একটা কল করা যাক। ও  
তো সব সময় অলয়ের খোজ খবর রাখে।

হ্যালো সুপ্তি।

- হ্যাঁ, তিহা বলো।

মুঠো ডরা বোদ



অলয়ের মোবাইল বন্ধ। কি হয়েছে অলয়ের জানো কিছু?

- কখন থেকে?

এই তো দুপুর থেকে।

- দুপুরে তো আমি অলয়কে স্টুডিওতে দেখলাম। গেস্টের সাথে কথা বলতে।

আচ্ছা ঠিক আছে। এই বলে তিহা কলটা কেটে দিল।

রাত আড়াইটা। তিহার মোবাইলটা বেজে উঠলো। তিহা এখনো ঘুমোয় নি তাই মোবাইলটা এখনো অন করা। মোবাইলের স্ক্রিনে অলয়ের নামটা দেখা যাচ্ছে। তার মানে অলয় কল করেছে। ফোনটা রিসিভ করলো তিহা। কিন্তু একটু শব্দও করলো না।

ওপাশ থেকে অলয়, কিরে? মোবাইলটা অন করতেই দেখি একটার পর একটা তোর মেসেজ আসছে তো আসছেই। প্রথমটা বাদে সবগুলোতেই, শয়তান, কুত্তা, হারামী আরো কত কি লিখেছিস। ঘটনা কি?

রাগান্বিত স্বরে তিহা বলল, ঘটনা কি তুই জানিস না?

না তো।

- আজকে আমাকে রেস্টুরেন্টে একা ফেলে এসেছিস কেন?

ওহো, সরি দোস্ত, হঠাৎ একটা কল আসে। বলল স্টুডিওতে এখনি যেতে হবে। গেস্ট এসেছে। তোকে বলতে ভুলে গিয়েছে। সরি দোস্ত।

- আচ্ছা সেটা না হয় মানলাম কিন্তু মোবাইল বন্ধ করে রেখেছিলি কেন?

চার্জ ছিল না।

- স্টুডিওতে কি চার্জার নেই?

মুঠো ডরা বোদ





আছে কিন্তু পিন নষ্ট। এই মাত্র বাসায় এসে মোবাইল চার্জ দিলাম আর তোর মেসেজ পেয়ে কল দিলাম।

- তোর সাথে এখন আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। রেস্টুরেন্ট থেকে নিয়ে আসা খাবারগুলো ফ্রিজে রাখা আছে। কাল এসে নিয়ে যাস।

ওকে। যখন কথা বলতে ইচ্ছে করবে কল করিস। গুড নাইট। এই বলে অলয় কলটা কেটে দিল।

দুপুর ১২টা। অলয়ের মোবাইল বেজে উঠলো। ঘুম কাতুরে দেহ নিয়ে কলটা রিসিভ করল অলয়।

হ্যালো।

- কি করছিস?

ঘুমাচ্ছি। কে আপনি?

- মোবাইলের স্ক্রিনে তাকিয়ে দেখ।

পারবো না।

- আজকে না তোর স্টুডিওতে এডিটিং এর কাজ আছে।

বিকেল ৪টায়।

- আমি দেখতে আসবো।

আসিস। এখন কলটা রাখবি? আমাকে একটু ঘুমাতে দে।

এই বলে অলয় কলটা কেটে দিল।

মুঠো ডরা বোদ

তিহা স্টুডিওতে বসে আছে। কিছুক্ষন পরই সুপ্তি স্টুডিওতে ঢুকল। তিহাকে দেখেই সুপ্তি জিজ্ঞেস করলো,

আরে তিহা তুমি? কখন এসেছো?

- এই আধঘন্টা। অলয় আসবে না?

তুমি কিছু জানোনা?

- না তো।

আজ তো অলয় আসতে পারবে না। কিছুক্ষন আগে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

- ও তাই।

তোমাকে কিছু বলে নি?

তিহা না সূচক মাথা নাড়িয়ে বলল, আচ্ছা সুপ্তি আমি তাহলে যাই।

ওকে।

এই বলে তিহা বেরিয়ে গেল। বের হয়ে তিহা অলয়কে কল দিল।

হ্যালো, মিঃ অলয় স্পিকিং। কাকে চাই?

- হারামজাদাকে।

কেন?

- তুই কই এখন?

কেন বাসে।

- কোথায় যাচ্ছিস?

মুঠো ডরা বোদ



সিলেটে।

- আমাকে একবার জানাতে তো পারতি।

মনে ছিল না।

- আমার কথা তো তোর মনেই থাকে না। সুপ্তিকে তো ঠিকই জানিয়েছিস।

মানে কি? কি বলছিস তিহা?

- তোর আর মানে বুঝে কাজ নেই। তুই তোর মত থাক। বাই।

ওকে দোস্ত।

অনেক রাগান্বিতভাবে কলটা কেটে দিল তিহা।

দুইদিন পর

অলয় সিলেট থেকে ঢাকায় এসে কল করলো তিহা কে। তিহা ক্লাসে থাকায় কলটা কেটে দিচ্ছে। কিন্তু নাছোড়বান্দা অলয় কল করেই যাচ্ছে। একসময় তিহা ক্লাস থেকে বের হয়ে কলটা রিসিভ করলো।

তিহা অনেকটা উচ্চস্বরে, কি হয়েছে? কল করছিস কেন?

তুই কল কেটে দিচ্ছিস যে?

- আমি ক্লাসে তাই কেটে দিচ্ছি।

ক্লাসে কি করিস?

- ক্লাসে মানুষ কি করে?

ও আচ্ছা। আজ নাকি পহেলা ফাল্গুন?

মুঠো ডরা বোদ

- তো কি হয়েছে?

বিকলে বের হবি। চল না একটু ঘুরে আসি।

- তোর সাথে কখনোই না।

কেন আমি আবার কি করলাম?

- তুই তো ঠিকমত কিছুই করতে পারিস না।

না! না! আজ ভুল হবে না।

- ঠিক বলছিস তো?

হুম। আমি বাইক নিয়ে আসবো তুই রেডি হয়ে থাকিস।

- ঠিক আছে।

তিহা ক্লাস শেষ করে বাসায় গিয়ে ফ্রেশ হয়ে অলয়ের সাথে ঘুরতে বের হওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে।

রেডি হয়ে বসে আছে তিহা। অলয়ের আসার কোনো খবর নাই। অলয়ের দেরি দেখে তিহা অলয়কে কল করল।

হ্যালো।

- আমি তো রেডি।

বাহ! কোথায় যাচ্ছিস?

- মানে কি?

মানে কোথায় যাচ্ছিস? বলতে না চাইলে বলতে হবে না। সাবধানে যাস।

মুঠো ডরা বোদ



- তোর না আজকে আসার কথা?

আমার? কোথায়?

- তুই না দুপুরে কল করে বললি আজ বিকেলে আমাকে নিয়ে ঘুরতে যাবি?

ওহ! দোস্ত, আমি সত্যিই ভুলে গেছি। কিন্তু এখন তো আসা সম্ভব না।

- কেন?

স্টুডিওতে এডিটর এসেছেন। উনার সাথে কাজ করছি।

- তুই আর জীবনেও আমার বাসায় আসবি না। আমাকে আর কল করবি না।

এই বলে তিহা কলটা কেটে দিল।

১৪ই ফেব্রুয়ারী। সকাল ৯টা। মোবাইলের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলো তিহার।  
ক্ষিণে ভেসে উঠছে অলয়ের নাম। অনেক অনিচ্ছা সত্ত্বেও কলটা রিসিভ  
করলো তিহা।

ওপাশ থেকে অলয় বলছে, ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করা  
যাক দিনটা। মনে হচ্ছে সকালের সূর্যের আলোটা এখনো তোর চোখে পড়েনি।  
জানালার ভারী পর্দা সরিয়ে সকালের সূর্যের আলো গায়ে মাখিয়ে বারান্দায়  
একটু আসবি?

- অলয় ফাজলামী করিস না। প্লিজ। ঘুমোতে দে।

প্লিজ আয়। ফাজলামী করছি না।

কেন জানি অলয়ের কথাগুলোর প্রতি ভালোলাগা কাজ করে সে বারান্দায় গিয়ে  
দাড়ালো।

- বারান্দায় তো আসলাম। এবার?

মুঠো ডরা বোদ

প্রিলের ফাক দিয়ে নিচের দিকে তাকা, অল্পবয়সী বাচ্চারা তাদের ইচ্ছেমত খেলাধুলা করছে। যে খেলার কোনো নাম নেই। দেখছিস তো?

- হুম।

এখনি আকাশে দিকে তাকিয়ে দেখ একঝাঁক সাদা কবুতর সকালের রোদে স্নান করছে আর আকাশের এপাশ থেকে অপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। দেখতে পাচ্ছিস?

- হুম পাচ্ছি।

টেবিলের উপর রাখা গরম চায়ে তো এখনো চুমুক দিস নি। ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তো। চুমুক দিয়ে নে আগে।

চায়ের কথা বলাতে তিহা টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলো এক কাপ চা টেবিলের উপর পিরিচ দিয়ে ঢেকে রাখা আছে। সে কাপটা হাতে তুলে নিয়ে চুমুক দিল তাতে।

ওপাশ থেকে অলয়, কিছুক্ষনের জন্য তাকে স্তব্ধ হতেই হবে কেননা একটু পড়েই কলিং বেল বেজে উঠবে।

ঠিক কিছুক্ষণ পর তিহাকে অবাক করে দিয়ে কলিং বেল বেজে উঠলো। তিহা তাড়াতাড়ি করে দরজা খুলতে গেলো। কিন্তু ওপাশ থেকে অলয় বলে উঠলো, তাড়াহুড়ো করিস না। একটু দাঁড়া। আগে বল দরজা খুলে তুই কি দেখতে চাস?

- তোকে।

আমাকে কেন?

- জানিনা। এইবলে তিহা দরজা খুলল।

মুঠো ডরা বোদ





দরজা খুলে তিহা দেখতে পেল অনেক বড় একটা ফুলের তোরা। পুরো  
তোরাটাই গোলাপ দিয়ে সাজানো।

গোলাপগুলো পছন্দ হয়েছে? ওপাশ থেকে অলয় বলল।

- হুম অনেক।

একটু ভালো করে খুজলেই একটা নীল খাম পাবি।

তিহা নীল খামটা খুজে পেল।

- কি আছে এটাতে?

খুললেই বুঝতে পারবি।

তিহা খামটা খুলল। ভিতরে একটা নীল কাগজ।

- কাগজে তো কিছু দেখতে পারছি না।

সূর্যের আলোর সামনে নিয়ে আসলেই দেখতে পাবি। নীল কাগজে নীল  
কালিতে কিছু একটা লিখা আছে।

তিহা কাগজটা বারান্দায় নিয়ে গেলো। লেখাগুলো এখন দেখা যাচ্ছে।

ওপাশ থেকে অলয়, লেখা দেখতে পাচ্ছিস?

- হুম।

কি লিখা আছে? জোরে জোরে পড়।

- মনে হচ্ছে তো তোর লিখা কবিতা। আচ্ছা পড়ছি।

“তোর সারাটিদিনে একটুও কি

মনে পড়েনা আমার কথা?

মুঠো ডরা বোদ

ছোট ছোট হাসির মিছিলে  
 যায় না কি, এই নামটি দেখা?  
 আমিও তোকে হাসিয়েছিলাম  
 কোনো এক মূহুর্ত জুড়ে,  
 হঠাৎ নীরব কান্নার মাঝে  
 কোথায় গেলি হারিয়ে।

ক্লান্তি এখন মোর দু'চোখে  
 তবুও কাটছে বেলা আকাশ দেখে।  
 জোছনা রাতে কেনো আমি  
 সুখ খুঁজে পাই আঁধারে,  
 ইচ্ছে জাগে তোকে নিয়ে  
 পালিয়ে যাই দূর পাহাড়ে।

স্বপ্নময় রঙিন স্মৃতি  
 পড়ছে মনে ভীষণ,  
 একলা আমার উদাস মনের  
 উঠছে ভিজে চোখের কোন

মুঠো ডরা বোদ



রবি ঠাকুর এক নির্মম সত্য বলে গিয়েছিলেন,

“বালিকা ভালোবাসে কবিকে

আর বিয়ে করে ব্যবসায়ীকে”

কাগজের শেষভাগে এসে তিহা তার পড়ার গতি থামিয়ে দিল।

ওপাশ থেকে অলয়, কিরে থেমে গে লি যে? পড়ছিস না কেন? কি লিখা আছে  
বাকিটুকুতে?

- সত্যি বলছি, তোকে খুব ভালোবাসি

ধন্যবাদ, ওপাশ থেকে অলয়।

- সত্যি কি তুই আমাকে ভালোবাসিস?

হুম। কিন্তু তুই কি রবি ঠাকুরে এই নির্মম সত্য মিথ্যা প্রমাণ করতে পারবি?

- হুম।

কিভাবে?

- আমি ভালোবাসি কবির কবিতাকে আর বিয়ে করতে চাই কবিকে।

কিছুক্ষনের জন্য হলেও অলয় চুপ হয়ে গেল। আমি সত্যিই তোকে অনেক  
ভালোবাসি।

ভালোবাসার এই কথোপকথনের মাঝে আর নাই যাই। প্রত্যেকে তার নিজের  
মত করে ভালোবাসা প্রকাশ করুক। এটাই হবে তার জন্য সত্য ও সুন্দর  
ভালোবাসা। তাদের এই কথোপকথনে একটি পরিচিত সুর লাগাতে পারি।

“তোমার জন্য নীলচে তারার একটুখানি আলো  
ভোরের রং রাতে মিশে কালো..

মুঠো ডরা বোদ

কাঠ গোলাপের সাদার মায়া মিশিয়ে দিয়ে ভাবি  
আবছা নীল তোমার লাগে ভালো।

ভাবনা আমার শিমুল ডালে লালচে আগুন জ্বালে  
মহুয়ার বনে মাতাল হাওয়া খেলে।  
একমুঠো রোদ আকাশ ভরা তারা  
ভেজা মাটিতে জলের নকশা করা..  
মনকে শুধু পাগল করে ফেলে।

তোমায় ঘিরে এতগুলো রাত অধীর হয়ে জেগে থাকা  
তোমায় ঘিরে আমার ভালো লাগা ।  
আকাশ ভরা তারার আলোয় তোমায় দেখে দেখে  
ভালোবাসার পাখি মেলে মন ভোলানো পাখা ।

কিছু কথাঃ আজকাল প্রায়ই দেখা যায় খুব ভালো বন্ধু ভালোবাসার  
পাত্র/পাত্রীতে পরিনত হয়। আমি মনে করি, একমাত্র বন্ধু তার বন্ধুকে খুব কাছ  
থেকে যাচাই করতে পারে। যাদের সম্পর্ক বন্ধু থেকে ভালোবাসায় পরিনত  
হয়েছে, তাদের প্রতি রইল আমার শুভকামনা।

এই গল্পটি খুব কাছের কিছু বন্ধু মাহফুজ, সোহান, রনি, স্বপ্ন এবং দ্বিধাকে  
উৎসর্গ করা হল।

দুরন্ত জেসি

ইমেইলঃ [durontojc@gmail.com](mailto:durontojc@gmail.com)

মুঠো ভরা রোদ



## যতসামান্য প্রেম নগণ্য!

১.

কবির প্রেম বিষাদ কাঠির দমে দমে,  
কবির প্রেম বিষের বাঁশিতে,  
কবির প্রেম গলায় ঢেলে দেয়া গরলে,  
কবির প্রেম চোখের তারায় তারায় আর মনের চিলেকোঠার নিরব বারান্দায়।  
তারপর যদি কিছু বাকি থাকে- সেটুকু নারীর জন্য!

২.

ওই অল্প যেটুকু, তাতেই কবির প্রেম- অসীম অফুরন্ত  
আর যদি সবখানি প্রেম নারীর জন্য হতো, তাহলে কী হত!

৩.

সর্বগ্রাসী হয়ে- কবি সবকিছু শেষ করে দিত।  
কবির প্রেম যে লাভার মতো দাহ, ঝড়ের মতো অশান্ত!

৪.

নারীর জন্য কবি প্রেম- অল্পই ভালো  
সবখানে সব প্রেম চলে যাক, বাকিটুকু নারীর জন্য থাক।  
নারীও কিছু ভালোবাসা পাক।

৫.

কবিও সারাক্ষণ, প্রেমে প্রেমে সাঁতরাক!

মুঠো ডরা বোদ

## দূর থেকে দেখা দূরবীন

তুই বলেছিলি- আজ আমার খারাপ লাগবে

এই গভীর রাতে নিঃসঙ্গতায় ডুবে যাব- একা মনে হবে নিজেকে।

বড্ড একাকী নিরবতা আমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাবে।

তখন তোর কথা মনে হবে।

অহম নিয়ে শাসিয়ে বলেছিলি- পাশে আছি তাই বুঝলিনে।

কই ! আজ তো তোর কথা মনে হলো না।

গভীর রাত । একাকী মনে হলো নিজেকে। তোর কথা মনে হলো না যে।

বন্ধরূমের সাদা দেয়াল নিঃসঙ্গতা হয়ে চেপে ধরে। দম আটকে রাখে।

খুব একলা মনে হলো নিজেকে। তোর কথা তো মনে হলো না রে..

তাহলে, প্রার্থণার সময় তুই যে কথাগুলো বলেছিলি- তা কি মিথ্যে !

তুই আমার কাছ থেকে ভালোবাসা চেয়েছিলি- অদৃষ্টের কাছে।

একবার শীতের রোদ হতে ইচ্ছে করেছে পৌষের মধ্যরাতে

আরেকবার চেয়েছি সরাই খেয়ে জ্বলতে। তোকে কেন মন থেকে চাইনি  
পেতে!

মুঠো ডরা রোদ



ওই যে বলেছিলি- ঢাকার যানঘাটে হঠাৎ চোখ আটকে যাবে,  
তোকে ভেবে চমকে যাব- তোর মতো কাউকে দেখে ভুলে।  
আমি তো চমকাইনি। তুই এতো মিছে বলতি কেন রেনী !

'যদি কখনো ফিরে আস, আদর করে নেব, ফিরে এস লক্ষীটি'- হোক না  
মিছে,  
বা অ-মিছে কথা।

তবে ভালোলাগা ভালোবাসা ভাব ছুঁয়ে- এমন কথাই তো লিখেছিলি।  
দুটো কমা আর দুটো উরধ কমার ছোট্ট একটা চিঠি।

কি জানি বাবা ! হতেও পারে । হয়তো ভালো বেসেও ছিলি।  
কিন্তুউ, আমার যে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে নি।  
তারমানে, এখন ভালোবাসিসনা তুই- আগেই শুধু বাসতি।

বর্ণচোরা

ইমেইলঃ paglaraza@gmail.com

মুঠো ডরা বোদ

## তুমি আমায় বেঁধেছো বৃত্তের পরিধিতে

হাতের কাজ সেরে অফিস থেকে বের হতে হতে নয়টা বেজে যায়। গাড়িতে উঠেই এফ .এম টা অন করে দেয় বৃত্ত। এমনতেই অনেক দেরি করে ফেলেছে। রেডিও মান্তির মঙ্গলবারের এই প্রোগ্রামটা পারতে ও কখনোই মিস করে না।

“এতোক্ষন শুনলেন আমাদের আজকের গেস্ট রাইমার ভালোবাসা গল্প। প্রোগ্রামের এই পর্যায়ে নেবো ছোট্ট একটা ব্রেক। কোথখাও যাবেন না, ফিরে আসছি একটু পরেই.....লিসেনার ফ্রেন্ডদের রিকুয়েস্টে আমার ভালোবাসার গল্প নিয়ে। শুনতে থাকুন রেডিও মান্তি, ৯১.৪।”

স্টার্টিং দিতে গিয়েও থেমে যায় বৃত্ত। ও কি ভুল শুনলো কিছু !

“হ্যালো ফ্রেন্ডজ ব্রেকের পর আবার ফিরে এলাম আপনাদের পছন্দের শো “ভালোবাসার গল্প” এর ভ্যালেন্টাইন এপিসোড নিয়ে আর সাথে আছি আমি আরজে বিন্দু। আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে, প্রোগ্রামের এই পর্যায়ে কোনরকম ফোন কল অর এস.এম.এস রিসিভ করা হবে না।

রোজ সকাল আটটায় ঘুম ঘুম চোখে আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম শুধু একটিবার দেখবো বলে। ফুলশ্ৰিত টি-শার্ট, ক্ল/ব্ল্যাক জিন্স, মাথার চুলগুলো এলোমেলো, চোখে হাই-পাওয়ারের একটা চশমা - যদিও তাতে বিন্দুমাত্র আতেল আতেল ভাব ছিল না। চশমা জিনিসটা আমি দুইচোখে দেখতে পারি না। যদিও বহুদিনের পর্যালোচনায় আমি লক্ষ্য করলাম যে, এ পর্যন্ত যতজনকে আমার ভালো লেগেছে, তাদের সবার নাকের ডগাতেই চশমা বাবাজী ছিলেন। কোন ভালো লাগাই অবশ্য মাসখানেকের বেশি টিকেনি। হাহাহাহা...কি ভয় পেলেন? ভয় পাওয়ার কিছু নেই, যে কাউকে ভালো তো লাগতেই পারে। ভালোবাসা আর ভালো লাগা তো আর এক না। যাইহোক আমি খেয়াল করে দেখলাম, এক মাস নয়, দুই মাস নয়, পাক্কা ছয় মাস ধরে আমি রোজ সকালে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। খুব যে আহামরি ছিল তাও নয়, তবুও কেন জানি ভালোই লাগতো ওকে দেখতে। মেডিক্যাল সাইন্সের মতে, “কারো প্রতি তুমি যদি ক্রাশড হও আর সেটা যদি চার মাসের

মুঠো ডরা বোদ



বেশি সময় স্থায়ী হয়, তাহলে বুঝবে তুমি তাকে ভালোবাসো। “ আর সেই থিওরি অনুযায়ী, ততদিনে আমি বৃত্তকে ভালোবেসে ফেলেছি । যদিও কেন ভালোবেসেছি তা জানি না । হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, ওর নাম বৃত্ত। আর আমি বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু। আমার ফ্রেন্ডরা সেটা বলেই আমাকে ক্ষ্যাপাতো। কিন্তু মুখে যতই অসন্তুষ্টি দেখাই না কেন মনে মনে ওকে নিয়ে ক্ষেপানোর ব্যাপারটা আমিও এনজয় করতাম।

বৃত্তর সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল কলেজের রি-ইউনিয়নে। সাদা একটা গেঞ্জি, তার উপরে কালো টিশার্ট, শার্টের বোতামগুলো খোলা, গেঞ্জির গলায় একটা কালো সানগ্লাস। এনাউন্সমেন্টের পর ও যখন স্টেজে ওঠে তাহসানের “প্রেমমাতাল” গানটা গাইলো, মনে হচ্ছিল গানটা বুঝি আমার জন্যই। মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলাম সেদিন ওর গান। এরপর কোথায় যে হারিয়ে গেল ছেলেটা আর খুঁজেই পেলাম না। কিন্তু না বেশিদিন ওকে না দেখে থাকতে হয়নি আমার। ফেসবুকে কলেজের গ্রুপে গিয়ে সার্চ দিতেই পেয়ে গেলাম আমার বৃত্তকে। সেদিনই জানলাম বৃত্ত আমাদের ভার্চুয়ালিটিতেই পড়ে। অথচ এর আগে ওকে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়লো না। রিকুয়েস্ট পাঠানোর সাহস হয়নি, তাই পাঠাইনি। কিন্তু প্রতিবেলা একবার করে ওর প্রোফাইল থেকে ঘুরে আসতাম।

মাসখানেক পর পাশের ফ্ল্যাটের মানুষজন আসলো। আমাদের এপার্টমেন্টের বয়স বছরখানেক হলেও আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশীরা কি সমস্যার কারনে জানি প্রথমদিকে ফ্ল্যাটে ওঠেনি। তো ওনারা আসার পর আম্মু একদিন বললো আমাকে নিয়ে ঘুরে আসবে। তারপর আম্মুকে নিয়ে সময় করে একদিন গেলাম। আম্মু আর পাশের ফ্ল্যাটের আন্টি বসে বসে গল্প শুরু করলো। বসে বসে বোর হওয়ার কোন মানে হয়না ভেবে আমি উঠে ঘরে ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু হঠাৎ করেই চোখ আটকে গেল একটা রুমের। কারন সেই রুমের ওয়ালে যে ছবিটা ঝোলানো ছিল তা থেকে আর যার পক্ষেই সম্ভব হোক অন্তত আমার পক্ষে চোখ সরানো সম্ভব ছিল না। বুঝতেই পারছেন কেন? হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, ওটা বৃত্তরই ছবি ছিল।

সেদিনের আগ পর্যন্ত বৃত্ত ছিল আমার কাছে টিভির নাটক-সিনেমার হিরোদের মতো যাদেরকে মন ভরে দেখা যায়, কল্পনা করা যায় কিন্তু কখনো ছোঁয়া

মুঠো ডরা বোদ



যায়না। কিন্তু সেদিনের পর ওকে পাওয়ার একটা স্কীন আশা আমার মনের প্রাসাদে টিমটিম করে জ্বলে উঠলো।

সেই থেকে বৃত্তদের বাসায় আমি প্রায়ই যেতাম। আন্টি মানে বৃত্তের মাও ভীষন স্নেহ করতো আমাকে। মিষ্টি খাবার খেতে আমার একদম ভালো লাগে না। কিন্তু আন্টির হাতের পায়ের ছিল যেন এক অমৃত। সেই পায়ের যে না খেয়েছে তার জীবনের এক আনা কনফার্ম বাকি আছে। বৃত্তদের সারা ঘরে ঘুরে বেড়াতাম আমি। চেষ্টা করতাম ওর অস্তিত্বটাকে উপলব্ধি করার। অথচ এসবের কিছুই ও জানতোনা।

বৃত্তরা আমাদের এলাকায় আসার পর থেকে একটা দিনও ওকে না দেখে কাটাই নি আমি। কোনদিন সকালে যদি ঘুম থেকে উঠতে দেরি হত অথবা কোন কারনে ও আর্টটোর বাসে না যেতো, সেদিন ক্যাম্পাসে ওদের ডিপার্টমেন্টের সামনে গিয়ে ফ্রেন্ডদের নিয়ে আড্ডা দিতাম। দেখা না হয়ে যাবে কই! নিজেকে তখন খুব বখাটে বখাটে মনে হতো। কিন্তু তাতে কি?? এসব আমি খোড়াই কেয়ার করতাম।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, আমার এই এতোসব পাগলামির কথা বৃত্ত জানতোই না। জানবেই বা কি করে বলুন? ও তো আমাকে চিনতোই না। আমি জানতাম, ওকে যদি কখনো ডেকে জিজ্ঞেস করতাম আমাকে আগে দেখেছে নাকি, ও সেটাও বলতে পারতো কিনা সন্দেহ ছিল। কিন্তু তা নিয়ে আমার কোনদিনও কোন মাথা ব্যথা ছিল না।

বৃত্তের সবচেয়ে যে জিনিসটা আমার ভালো লাগে তা ওর চোখ। ঐ চোখের দিকে তাকানোর কখনো সাহস হয়নি আমার, যদি ধরা পড়ে যাই। কিন্তু ধরা পড়া সে তো আমার ভাগ্যে খোদাই করা ছিল, না পড়ে উপায় আছে। কথায় আছে না, চোরের দশ দিন আর সাধুর একদিন।

থার্স্ট ফার্স্ট ডিসেম্বরের রাতে পুরো এলাকায় যেন আতশবাজি পোড়ানোর মহড়া বসেছিল। আম্মুকে অনেক বলে কয়ে রাজি করিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছাদে গিয়ে বাজি পোড়ানো দেখছিলাম। ঠান্ডায় জমে যাওয়ার মতো অবস্থা। ঠিক কানের পাশ দিয়েই ভেসে গেলো কথাটা, “হ্যাপি নিউ ইয়ার”। ফিরে তাকাতেই দেখি বৃত্ত। শীত যেন আরো দ্বিগুন হয়ে জেঁকে বসলো আমার উপর। পাল্টা উইশ যে করবো সে অবস্থাও নেই। গলা দিয়ে কোন শব্দই বের

মুঠো ডরা বোদ



হচ্ছে না। অনেক কষ্টে উইশের রিপ্লাই দিলাম। এক চিলতে হাসি ফুটে উঠলো ওর ঠোঁটে। তারপর ভূতের মতো উধাও হয়ে গেল ছেলেটা। বুঝতে পারলাম না সেই হাড় কাপানো শীতের রাতে একা ছাদে দাঁড়িয়ে আমি কি স্বপ্ন দেখলাম নাকি সত্যি দেখলাম। ভূত-টুতও তো হতে পারে - এই কথা মাথায় আসতেই পড়ি কি মরি করে দিলাম ছুট। বড্ড বাঁচা বেঁচেছিলাম সেদিন। সেদিন উপর থেকে কেউ একজন হয়তো হেসেছিলেন, এমন ভীতু মেয়ের প্রেম করার শখ দেখে। কে জানতো এই মেয়েই একদিন এতো সাহসী হয়ে উঠবে।

ওকে ফ্রেন্ডজ, ভালোবাসা গল্পের এই পর্যায়ে নেবো ছোট্ট একটা ব্রেক। কোথথাও যাবেন না, ফিরে আসছি একটু পরেই। শুনতে থাকুন রেডিও মাস্তি, ৯১.৪।”

\*\*\*

বিন্দুর অনেক আগে থেকেই বৃত্ত ওকে চিনতো। ভালোই লাগতো ওর বিন্দুর চঞ্চলতা দেখতে। এতো চঞ্চল মেয়ে বৃত্ত আগে কখনো দেখেনি, এমনকি এখনো পর্যন্ত না।

রোজ রোজ বিন্দুর বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকাটা বৃত্তর বেশ লাগতো। ও কখনো ভাবেনি যে ওর জন্যও কেউ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বিন্দুর বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা, ডিপার্টমেন্টের সামনে গিয়ে আড্ডা মারা সবই বৃত্ত দেখতো কিন্তু কখনো বিন্দুকে বুঝতে দেয়নি।

হুমম...থার্স্ট ফার্স্ট ডিসেম্বরের রাতটার কথা বৃত্তর আজো মনে আছে। ও সেদিন সত্যিই ছাদে গিয়েছিল, বিন্দুকে উইশও করেছিল। কিন্তু বিন্দু এতোটাই চমকে গিয়েছিল যে পরে ও মন খারাপ করে দরজার আড়ালে চলে গিয়েছিল। কিন্তু যখন বুঝতে পারলো বিন্দু ওকে ভূত মনে করে ভয়ে পালিয়ে গেল সেই মুহুর্তে হাসতে হাসতে ওর গড়াগড়ি খাওয়ার অবস্থা। বিন্দুকে প্রায়ই এই কথা বলে ক্ষেপায় ও।

\*\*\*

মুঠো ডরা বোদ



“হ্যালো ফ্রেন্ডজ ব্রেকের পর আবার ফিরে এলাম আপনাদের পছন্দের শো  
“ভালোবাসার গল্প” এর ভ্যালেন্টাইন এপিসোড নিয়ে আর সাথে আছি আমি  
আরজে বিন্দু।

চার চারটা বছর কেটে গেল কিন্তু ভার্শিটি লাইফের একটা পহেলা ফাল্গুনও  
পালন করা হয়নি দেখে ফ্রেন্ডরা মিলে ঠিক করলাম এবার যেমন করেই হোক  
আমরা আসছি। অনেক মজার একটা দিন কাটিয়েছিলাম সেদিন। আর দিনটা  
ছিল আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা দিতে কখন  
যে সূর্য মা মা ওপারে পাড়ি জমিয়েছেন খেয়ালই করিনি। খেয়াল হতেই  
তরিঘরি করে বিদায় নিয়ে টি.এস.সির মোড়ে এসে দাঁড়িলাম। একটা রিক্সাও  
যাবেনা শুনে মেজাজটা চরম বিগড়ে গেল। চিৎকার চোঁচামেচি করে বিদ্রোহী  
অবস্থা।

“বিন্দু। এনিথিং রঙ?” ঘুরে তাকাতেই দেখি বৃত্ত দাঁড়িয়ে আছে। কিসের কি  
এনিথিং! ওকে দেখে আমার এভরিথিং রঙ হয়ে গেল।

“না মানে...দেখুন না একটা রিক্সাও পাচ্ছি না। রিক্সাওয়ালারা সব এক -  
একজন লাটসাহেব হয়ে বসে আছে। বাসায় যাবো কিভাবে সেই চিন্তায় মাথা  
ঠিক ছিল না। তাই...”

“হাহাহাহা...সেটা বুঝতে আর বাকি নেই। যদি কোন প্রব্লেম না থাকে তাহলে  
আমি লিফট দিতে পারি।”

কিসের প্রব্লেম কিসের কি। শুনে তো আমি আট দুগুনে ষোলখানা হয়ে  
গেলাম। “না, না আমার কোন প্রব্লেম নেই। কিন্তু...”

কথা শেষ করার আগেই বৃত্ত একটা রিক্সা ঠিক করে তাতে উঠে বসলো।  
“উঠুন।”

“হুম। উঠছি।”

“মামা যাও। কি জানি বলছিলেন তখন?”

“ও...না মানে বলছিলাম। আপনি আমাকে চেনেন?”

“বাহরে, একই এলাকায় একই এপার্টমেন্টে থাকি আমরা। না চেনার কি  
আছে?”

“হুম...তাও ঠিক। কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম...”

“কি ভেবেছিলেন?”

“না, কিছু না।” বলে একটা পানসে হাসি দেয়ার চেষ্টা করলাম।

মুঠো ডরা বোদ



“হুমম। বুঝলাম।”

“কি বুঝলেন?”

“যা বোঝাতে চাইলেন।” বলেই হাসা শুরু করলো বৃত্ত।

কি আজব! আমি তো কিছুই বলিনি। এ ছেলে কি বুঝতে কি বুঝলো ভেবেই আমার মাথা ভনভন করতে লাগলো। পুরোটা রাস্তাই চুপচাপ ছিলাম আমরা, বিশেষ করে আমি। ভয়ে ভয়ে ছিলাম কখন আবার কি বলতে কি বলে ফেলি। যাইহোক বাসায় ফেরার পর ও রিক্সা ভাড়া মেটালো। তারপর দুজনে লিফটে উঠলাম। ও চারতলায় আর আমি ছয়তলায় নামবো। চারতলায় লিফট আসতেই ও নেমে গেল। হঠাৎ কি মনে করে ওপেন বাটন হোল্ড করে বললো, “২০ তারিখ থেকে আমার একজামা!”

“তো?”

“আটটার বাসে যাওয়া হবে না তাই। দশটার বাসে যাবো।” বলেই চলে গেলো। আর আমি ২৫০ ভোল্ট কারেটে শক খেয়ে স্ট্যাচু হয়ে গেলাম। তার মানে বৃত্ত সব জানে। সেই মুহুর্তে আমার চেহারা দেখতে কেমন হয়েছিল জানিনা। হয় পাকা টমেটোর মতো মুখটা টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল আর নয়তো ১০ সেকেন্ড পালসের মতো মাথার চুলগুলো খাঁড়া হয়ে গিয়েছিল।

আর এভাবেই চলছিল আমাদের দিনগুলো। আমি নানারকম পাগলামি করতাম আর ও সময়ে সময়ে জানান দিয়ে যেতো যে আমি ধরা পড়ে গেছি। কিন্তু বৃত্ত যে কেন আমার এইসব পাগলামি মুখ বুজে সহ্য করে যেতো তা তখনো আমি বুঝে উঠিনি, হয়তো বুঝে উঠার চেষ্টাই করিনি।

চার-পাঁচ মাসের মাথায় বৃত্ত পাশ করে বের হয়ে গেলো আর আমারও অনার্স কমপ্লিট হয়ে গেলো। সেইদিনটার কথা আজো মনে আছে। সাত -সকালে বৃত্তকে ফোন দিয়ে বললাম দেখা করবো। ও ওর অফিসে যেতে বললো। সেখানে গিয়ে ওকে নিয়ে বের হয়ে একটা ক্যাফেতে বসলাম।

“কেমন আছো?”

“ভালো না।”

“কেন?”

মুঠো ডরা বোদ

আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম, “বাবা, আমার বিয়ে ঠিক করছে। আমাকে ডিসিশান নেয়ার সাত দিন সময় দিচ্ছে। আজকে তার শেষ দিন। কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত কোন ডিসিশান নিতে পারি নাই।”

“বলবা যে তোমার বলার কিছু নাই।”

“তোমার মাথা ঠিক আছে? তুমি জানো না মৌনতা সম্মতির লক্ষণ।”

“ও...তো আমি কি করবো?”

“কি করবো মানে? তোমার কিছু করার নাই?” বলেই আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

“কুল। বিন্দু। এটা রেস্টুরেন্ট। প্লিজ সিট ডাউন।” আমি বসার পর ও বললো, “আচ্ছা একটা কথা বলো তো। তোমার বাবা তোমার জন্য যাকে পছন্দ করেছে তাকে দেখেছো তুমি?”

“নাহ।”

“হুমম...তাহলে এক কাজ করো। বাসায় গিয়ে আগে তার ছবিটা দেখো। ওককে...চল এবার।”

কথাটা শুনেই আমার মনের মধ্যে একটা খটকা লাগলো যে এখানে সিনেমাটিক কোন ব্যাপার নেই তো। হয়তো আমি বাসায় গিয়ে দেখবো বাবা আমার জন্য বৃত্তকেই ঠিক করেছে। হলোও তাই। ছবিটা হাতে নিয়ে আমি যখন অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম ঠিক তখনি একটা ম্যাসেজ আসলো, “বিন্দু ছাড়া কি বৃত্তের কোন অস্তিত্ব আছে নাকি কখনো ছিল?”

আর এই হল আমাদের প্রেম কাহিনী।”

\*\*\*

এফ.এম টা অফ করে কিছুক্ষন চুপচাপ বসে থাকে বৃত্ত। আজ তিনদিন হলো বিন্দু রাগ করে বাবার বাড়িতে চলে গেছে। অন্য কোন ছেলে হলে পরের দিনই গিয়ে বউ এর রাগ ভাঙিয়ে নিয়ে আসতো। কিন্তু বৃত্ত ছিল তার ইগো প্রবলেম নিয়ে। যদিও ও জানে পুরো ঘটনার জন্য ওই দায়ী। তবুও স্ত্রীর কাছে হার স্বীকার করতেই যেন ছিল তার যত আপত্তি।

কিন্তু বিন্দু!!! এই মেয়েটাকে যত দেখে তত অবাক হয় বৃত্ত, সেই প্রথম দিন থেকেই হয়ে আসছে। কিন্তু বিন্দুকে কখনো তা বুঝতে দেয়নি। আসলে মেয়েটা

মুঠো ডরা বোদ



তার পাগলামি আর আহলাদিপনা নিয়ে এতোটাই ব্যস্ত থাকে যে তা বুঝে উঠতে পারেনি। অন্য কোন মেয়ে হলে অনেক আগেই বুঝে ফেলতো।

মাঝে মাঝে বৃত্তের বড্ড অদ্ভুত লাগে বিন্দুকে। এই যেমন আজকের ঘটনাটাই ধরা যাক, সারাটাদিন বৃত্ত মন খারাপ করে বসে রইলো বিন্দু ওকে ফোন করেনি বলে, যদিও সেটা করার কথা নয়। কারন ও জানে বিন্দু ভীষন রাগ করে আছে ওর উপর। অথচ দিন শেষে কি দেখতে পেল, বিন্দু ঠিক তার সারপ্রাইজ গিফটটা দিয়েছে। ওর আজকের প্রোগ্রামটাই ছিল বৃত্তকে নিয়ে। এর চেয়ে বড় সারপ্রাইজ আর কি হতে পারে। অথচ ও। আসলে বিন্দু ঠিকই বলে নিজেকে যতই চালাক ভাবুক না কেন ও আসলেই একটা বেকুব। নইলে এতোদিন ধরে কার সাথে ইগো দেখালো। উফফ...প্রচন্ড রাগ উঠছে ওর নিজের উপর।

কি করবে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হল রেডিও স্টেশনে গিয়েই বিন্দুকে চমকে দেবে। যেই ভাবা সেই কাজ। সোজা স্টেশনে গিয়ে হাজির। কিন্তু বিধাতা এবারো তার পক্ষ নিলনা। গেটের দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে জানলো যে বিন্দু মিনিট পাঁচেক আগে বেরিয়ে গেছে। বাকি থাকে একটাই উপায় আর তা হল বিন্দুদের বাসায় যাওয়া।

রাস্তায় প্রচুর জ্যাম। অলরেডি সাড়ে দশটা বেজে গেছে। বিন্দুদের বাড়িতে গিয়েই দ্রুত কলিংবেল বাজাতে থাকে বৃত্ত।

বিন্দুর মা দরজা খুললেন।

“বৃত্ত। তুমি? এসো ভেতরে এসো।”

“আন্টি, বিন্দু কই? ওকে ডাকুন না প্লিজ।”

“বিন্দু তো এখনো ফেরেনি। ফ্রেন্ডরা মিলে কোথায় জানি গেট-টুগেদার করবে বলেছিল। আচ্ছা আমি ফোনে জেনে নিচ্ছি কোথায়...”

“না থাক আন্টি। আমি বরং আজ আসি।” বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বৃত্ত।

ফোন করার কথা মাথায় আসলেও কল আর করে না ও।

বাসায় গিয়ে খাটে ধপ করে বসে পড়ে বৃত্ত। আজ পর্যন্ত বিধাতা কখনোই ওর পক্ষ নেয়নি শুধুমাত্র বিন্দুকে বিয়ে করার ডিসিশান নেয়া ছাড়া। ওর ভাগ্যটাই এমন। বুকের কাছটায় হাত রেখে চোখটা বন্ধ করে বৃত্ত। আংটিটা এখনো

মুঠো ডরা বোদ

পকেটেই আছে। তিনদিন ধরে এটাকে বুক পকেটে নিয়ে ঘুরছে বৃত্ত বিন্দুকে দেবে বলে। কিন্তু কি ভাগ্য যে আংটিটা আজ বিন্দুর হাতে থাকার কথা তা বৃত্ত এখনো পকেটে নিয়ে ঘুরছে।

“কোথায় কোথায় খুঁজতে যাওয়া হল, শনি।” কথাটা শুনেই চমকে উঠে বৃত্ত।

“তুমি এখানে! আর আমি তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে...”

“জানি। তাইতো চলে আসলাম। নইলে কি আর আসতাম।” বলেই দুষ্টুমির হাসি ফুটে ওঠে বিন্দুর ঠোঁটে।

“কিন্তু আন্টি যে বললো তুমি ফ্রেন্ডদের সাথে...”

“আম্মু যা জানে তাই বলছে। এখন আমি কি বলবো, আমি তোমাকে সারথাইজ দেয়ার জন্য এখানে চলে আসছি। কি ভাবে আম্মু শুনলে।”

“কিছু ভাবার কি আর বাকি রাখছো তুমি।”

“হইছে...অনেক বেশি বুঝে ফেলছো। এখন বল আমার গিফট কই।”

“ওহ শিট। ভুলেই গেছি। কি করে মনে থাকবে বলো। সারাদিন তো তোমাকে খুঁজতে খুঁজতেই গেলো।”

“সেটা তো আজকেই না খুঁজছো। গত দুদিন কি করছো?”

“বড্ড ভুল হয়ে গেছে। স্যরি। এবারের মতো মাফ করে দাও।” বলে বিন্দুকে জড়িয়ে ধরে। ইচ্ছে করেই হার স্বীকার করে বৃত্ত। এই হারের মাঝে যে কি আনন্দ বিন্দু তা জানেনা।

কিন্তু আর বুক পকেটের উপর হাত পড়তেই বিন্দু বুঝতে পারে যে বৃত্ত মিথ্যে বলেছে।

“আমি জানতাম তুমি এবারো ভুলে যাবে।” বলে মিথ্যে অভিমানে গাল ফোলায় বিন্দু। কিছুই বলেনা কারন ও জানে, ওর কাছে হারতেই বৃত্ত বেশি ভালোবাসে...

অচিন রূপকথা

ইমেইল: trisha\_32\_csedu@yahoo.com

মুঠো ডরা বোদ



## বলে যাও ভালবাসি

এসো, এসো আমার কাছে একটু সময় নাও -,  
শান্ত হয়ে বোস, দম ফেলবার সময়টুকু নাও ;  
এবার ভাল করে বলে যাও ভালবাসি। -  
আদর করে বলে যাও ভালবাসি। -  
বারবার ভাল করে বলে যাও ভালবাসি। -  
দিন ফুরোবার আগ পর্যন্ত বলে যাও ভালবাসি। -  
বলতে থাক অজস্র বার -  
যতক্ষণ না আমার  
এ দেহে, কামনার আঘাত পড়ে-  
বাসনার পাত্রগুলো যায় ছুমড়ে মুচড়ে,  
তোমার স্বপ্ন সপ্তমে চড়ে !  
আমার আবেগ, সুখগুলো ওঠে আলোড়ন করে,  
ততক্ষণ বলতে থাক ভালবাসি-, ভালবাসি!! ভালবাসি-

বলে যাও ভালবাসি -,  
যতক্ষণ না বলতে হয় আজ আসি। -  
বল উদার মনে, তোমার বিহনে-  
আমি নেই আমাতে। বল এই ক্ষণে  
ঝড়বন্যায়-, কী তপ্ত খরায় -  
সোনালী দিনে আর রাত্রির ছায়ায়,  
সব কাজের ভিড়ে একান্ত অবসরে -,  
জ্ঞানে অজ্ঞানে -, অনিদ্রার ঘোরে  
বল বল চিৎকার করে, ভালবাসি -  
তোমায় খুঁউব ভালবাসি ।

মুঠো ডরা বোদ

সবাইকে বলে যাও, “ভালবাসি”-  
এ শব্দটা আজ ও আগামীর।  
যত বাঁশী বাজেসব যে একই সুর সাথে।-  
বল আমি চাই শুধু তোমাকে -,  
সব কিছু বাদে। আর সবকিছু চরম ম্লান  
মুঢ় অর্বাচীন, একেবারেই মূল্যহীন  
আমাদের এই ভালবাসার পৃথিবীতে।

সেই শব্দ বারবার উচ্চারণ করো।  
আমার কানে মধু ঢালো, বেদনা দূর করো ;  
আর শুধু বলে যাও ভালবাসি। -  
তোমায় নিয়ে স্বপ্ন রাশি রাশি!  
আমায় মুগ্ধ করো আর বলে যাও !ভালবাসি -  
আমায় ভরিয়ে দাও, কৃপা করো, বলে যাও!!ভালবাসি -  
আমায় পূর্ণ করে যাও, আশীর্বাদ করো,  
বলে যাও!!ভালবাসি -

রেজওয়ান তানিম

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ মৌন মুখর বেলায়

বইমেলা ২০১২

ই মেইলঃ- rezwan.tanim@gmail.com

মুঠো ডরা বোদ



## দুঃস্বপ্নের মৃত্যু

নুহা তীব্র স্বরে বললো, “এসব কি বলছো মা?”

– “কেন, আগে থেকেই তো ঠিক করা আছে।”

– “আশ্চর্য! এখন কি আগের পরিস্থিতি আছে? দুদিন পর মারা যাচ্ছি আর আজ হবে এনগেজমেন্ট?”

– “মারা যাচ্ছিস কে বললো? অসুখ বিসুখ কোন ব্যাপার না। বিয়ের পর চিকিৎসা হবে, তুই সুস্থ হয়ে যাবি।”

– “আজগুণি কথা বলো না তো মা! বিয়েই হবে না আর বিয়ের পর চিকিৎসা! আমি অসুস্থ অবস্থায় কিছুতেই বিয়ে করবোনা। সুস্থ হয়ে নেই তারপর দেখা যাবে। আর হ্যাঁ মা, তুমি কিন্তু অবশ্যই তাদেরকে আমার অসুখের ব্যাপারে ইনফর্ম করবে।”

শাহানা আগে থেকেই ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিলেন, তিনি কথা সাজিয়েই এসেছেন। অনুরোধ করার ভঙ্গিতে বললেন, “প্লিজ, আজকের দিনটা যেতে দে। আমি অবশ্যই ওদেরকে তোর সমস্যার কথা জানাবো। আজকে সবকিছু ঠিক করা হয়ে গেছে, এখানে আর ঝামেলা করিস না। আর হ্যাঁ, তোকে কিছু বলতে হবেনা, এদিকটা আমিই সামাল দিব।”

নুহা হতাশ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকালো। মনে হচ্ছে না মা এ ব্যাপারে কোন কথা বলবে। যা করার তারই করতে হবে।

শাহানা চিন্তিত মুখে রান্নাঘরের দিকে এগলেন। অনেক কাজ বাকী পরে আছে। নুহার শ্বশুরবাড়ীর লোকজন আসবে। অনেক বড়লোক ফ্যামিলি, সবকিছু সাবধানে করতে হবে। ওদের অবশ্য নুহাকে খুব পছন্দ হয়েছে। পছন্দ না হবার কারণ নেই অবশ্য। মেয়ে তার রূপে গুনে কোনদিকে কম না।

তিনি সাবধানে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তাঁর ভাগ্যটাই এমন। হঠাৎ করে নুহার ক্যান্সার ধরা পরে গেল। অনেক কান্নাকাটি করে এখন নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছেন। শুধু কান্নাকাটি করলেই হবেনা। মেয়েকে পার করতে হবে। বিয়ের আগে কোনভাবেই অসুখের কথা জানতে দেয়া যাবেনা, তাহলে বিয়েটা হবেনা। বিয়ের পর জানলে ওরা নিশ্চয়ই চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। এত এক্সপেনসিভ চিকিৎসা তার দ্বারা করা সম্ভব না। নুহার শ্বশুর হালুস্থল রকমের বড়লোক। ছেলের বউকে নিশ্চয়ই দেশের

মুঠো ডরা বোদ

বাইরে নিয়ে চিকিৎসা করাবেন। এক টিলে দুই পাখি মারা হবে। ব্যাপারটা দেখতে খারাপ লাগছে ঠিকই কিন্তু কিছু করার নেই। বাস্তবতা খুব কঠিন। নুহা ঝামেলা করবে এটা আগে থেকেই ধরে রেখেছিলেন। এজন্য খুব সতর্কভাবে এগুতে হবে। খুব ভালো হয় আজ কোনভাবে হট করে বিয়ে হয়ে গেলে। বড়লোকের ব্যাপার-স্যাপার বোঝা যায়না। হয়তো দেখা যাবে একজন বলে বসবে আজই বিয়ে হয়ে যাক, তারপর বড় করে অনুষ্ঠান করা যাবে। একজন কাজি যোগাড় করে রাখা যায় কি? অনেক কাজ, বোনের ছেলেটাকে খবর দেয়া দরকার। ছেলেটা অনেক কাজের। আর তিনি একাই বা ক'দিক সামলাবেন?

নুহা চুপচাপ ভাবছে। সবকিছু সুন্দরভাবে সাজানো ছিলো। সপ্তাহ দুয়েক আগে ওর সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। ক্যানসারের মাঝামাঝি পর্যায়ে সে। এখনো ভালোভাবে চিকিৎসা করলে বাঁচার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সেজন্য দেশের বাইরে যেতে হবে। অনেক খরচের ব্যাপার, ওদের আর্থিক অবস্থা কোনকালেই এত ভালো ছিলোনা। বাবা মারা যাবার পর অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। মার ছোট একটা চাকরী আর বাবার পেনশনের টাকা দিয়ে চলছে সংসার। আর অসুখ নিয়ে বিয়ের কোন মানে হয়না। সবাই করুণার চোখে তাকাতে, এটা সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব না। ওরা অসুখের কথা জানলে অবশ্যই বিয়ে হবেনা এবং না জানিয়ে বিয়ে করলে বিয়ের পর অবশ্যই বড় ধরনের ঝামেলা হবে। তাছাড়া জেনেশুনে একজনের জীবনে ঝামেলা করার কোন মানে নেই। যে কটা দিন বাঁচে নির্ঝঞ্ঝাট বাঁচতে চায়।

নুহা ছোট করে একটা নিঃশ্বাস ফেললো। খুব কষ্ট হচ্ছে তার। কি হতো আর মাসখানেক পর অসুখটা ধরা পড়লে? কিংবা আবরারের সাথে বিয়ের কথা হবার আগে? কত স্বপ্নই না সে দেখেছিলো! গায়ে হলুদে কি কি গান বাজবে সেটাও ঠিক করে ফেলেছিলো। হানিমুনে কোথায় যাওয়া যায় সেটাও ঠিক করা আছে। আবরারকে নুহার বেশ পছন্দ হয়েছিল। সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে তার হাসিটা। এতো সুন্দর করে কেউ হাসতে জানে আবরারকে না দেখলে জানাই হতোনা নুহার।

জোর করে মাথা থেকে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেললো। মার উপর ভরসা করা যাচ্ছেনা। মনে হচ্ছে মা তাকে গছিয়ে দিতে চাইছে, অসুখের কথা জানাবেনা। তার ধারণা বিয়ের পর জানার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মেয়েকে নিয়ে ওঁরা আমেরিকা দৌড়ে যাবে চিকিৎসার জন্য, ওদের সে সামর্থ্য আছে। কি হাস্যকর কথা!

আচ্ছা, এখুনি আবরারকে ফোন করে দিলে কেমন হয়? সেটাই ভালো। বিয়ে হবেনা শুধু শুধু এনগেজমেন্টের মানে হয়না। যত দ্রুত সম্ভব এই পাট চুকিয়ে ফেলা ভালো। চোখের

মুঠো ডরা বোদ



পানি মুছলো সে। আবরারের সাথে কথা বলার সময় কিছুতেই কাঁদা যাবে না। মোবাইলটা কোথায় গেল? চার্জ আছে তো? মনে মনে কথা গুছিয়ে নিতে লাগলো নুহা।

পুরো বাড়িতে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। ভাইয়ের সাথে যাওয়ার জন্য জেবা চলে এসেছে, বড়চাচা এসেছেন। মেয়েরা সবাই সাজুগুজু নিয়ে ব্যস্ত। রশীদ সাহেব গিফটের দিকে খেয়াল রাখছেন। মেয়ের বাড়িতে ভালো ভালো উপহার নিয়ে যেতে হবে। রাহেলা বেগম এটা সেটার তদারকি করছেন।

শুধু যাকে ঘিরে এত আয়োজন তার কোন কার্যক্রম লক্ষ করা যাচ্ছে না। সে তার ঘরে শুকনো হয়ে বসে আছে।

নুহা মাত্র ফোন করেছে। ওর নাকি ক্যান্সার ধরা পড়েছে। সুন্দর করে গুছিয়ে বললো সব। এখন বিয়ের কোন মানে হয় না তাও জানালো। সম্ভবত তার মা না জানিয়ে বিয়ে দিতে চাচ্ছে।

ওর একবার মনে হলো এটা ভুয়া খবর। হয়তো নুহার পছন্দের কেউ আছে এতোদিন কোন কারণে বলতে পারেনি আজ এই ঘটনা সাজিয়েছে। নইলে এতো সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বললো কিভাবে? অবশ্যই সব সাজানো। পরক্ষণেই মনে হলো নুহা যা বলেছে সব সত্যি। চমৎকার এই মেয়েটা সত্যি সত্যিই মরণব্যাধিতে আক্রান্ত। হঠাৎ করে আবরারের প্রচণ্ড পানি পিপাসা পেয়ে গেল।

নুহা কিছুতেই হিসেব মিলাতে পারছেন না। ও না করে দেয়ার পরও ওরা এসেছে কেন? ভদ্রতা রক্ষা করার জন্য? কি দরকার ছিল? আবরারের সাথে কথা বলার সময় তো সে একদম চুপসে গিয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল প্রোগ্রাম ক্যানসেল। এখন কি মনে করে হঠাৎ?

ছাদে নুহা আবরারের মুখোমুখি বসে আছে। সে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে আবরারের দিকে। আবরার অবশ্য সেটাকে পাতা দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। নুহার অগ্নিদৃষ্টি উপেক্ষা করে সুন্দর করে হাসলো।

-“হাসছেন কেন?” কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলো নুহা।

-“এমনি”।

মুঠো ডরা বোদ



আবরার আবার হাসল।

-“শোন নুহা, তুমি রেগে আছো। একটু শান্ত হও”।

-“শুধু শুধু এসেছেন আপনারা। যাবার সময় ঠিকই না করে যাবেন। শুধু শুধু মাকে কষ্ট দিচ্ছেন। বেচারী আশা করে আছে। এই অভদ্রতাটুকু না করলে কি হতোনা”?

-“তুমি ভুল বলছো। আমি দ্রুত কাজ শেষ করতে চাই। হাতে বেশী সময় নেই”।

-“মানে কি? কিসের কাজ”?

আবরার আবরো হাসলো।

-“শুধু শুধু হাসবেন না। জোকায়ের মতো লাগছে আপনাকে”।

- “মোটোও না। আমার হাসি খুব সুন্দর এটা আমি জানি। তোমার রাগ কমে যাচ্ছে ”।  
আবরো হাসলো সে।

নুহা মুখ ঘুরিয়ে নিল। আবরারের কথা সত্য। নুহা খুব চেষ্টা করছে মুখটাকে কঠিন করে রাখতে, পারছেননা।

-“শোন নুহা আমি চাই আজকেই বিয়েটা হোক। কথা বার্তার এক পর্যায়ে বড়চাচা বিয়ের কথা তুলবেন। এভাবে প্ল্যান করেই এসেছি। খুব দ্রুত তোমাকে দেশের বাইরে নিয়ে যাব। এজ আরলি এজ পসিবল্। আরেকটা কথা, মা-বাবাকে এটা এখনি জানানোর দরকার নেই। আমিই সব জানাবো”।

নুহা মনে হলো সে ঘোরের মধ্যে আছে। এসব কি শুনতে পাচ্ছে? সব শুনেও ছেলেটা কেন রাজি হচ্ছে? আস্তে আস্তে ওর মুখের কাঠিন্য সরে যাচ্ছে। বেঁচে থাকার লোভ অনেক বড় লোভ। সুন্দর একটা জীবনের হাতছানি থেকে চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করছেননা কেন যেন। সে দ্বিধায় পড়ে গেছে।

না না! তার অবশ্যই নিষেধ করা উচিত।

-“এসব কি বলছেন? কেন জীবনে ঝামেলা জড়াবেন? তাছাড়া আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও খুব কম”। ক্ষীণকণ্ঠে বললো নুহা, কণ্ঠে আগের মতো জোর নেই।

-“কেন বলছি জানো? আজকে তোমার ফোন পাওয়ার পর আমি আবিষ্কার করলাম তোমাকে ছাড়া আমি চলতে পারবোনা। অল্প বাঁচার কথা বলছো? তুমি যত অল্পই বাঁচো না কেন তোমাকে আমার খুব দরকার। প্লিজ তুমি না করোনা”।

মুঠো ডরা বোদ



নুহার সারা শরীর কেঁপে উঠছে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন। সব স্বপ্ন না তো? এখুনি হয়তো ঘুম ভেঙ্গে যাবে। সে আবরারের দিকে তাকালো।

-“প্লিজ নুহা”!

আবরারের চোখে অনুনয়, মুখে অভয়ের হাসি। সে হাসিতে ওলট-পালট হয়ে গেলো নুহার একা থাকার সমস্ত পণ। আবরারকে সে এখন দেখতে পাচ্ছেনা। চোখভর্তি জল নিয়ে কি কাউকে দেখা যায়?

পাশের বাড়িতে কে যেন গান ছেড়ে রেখেছে-

...ছিল মন তোমারি প্রতিষ্ঠা করি

যুগে যুগে দিন রাত্রি ধরি

ছিল মর্মবেদনা ঘন অন্ধকারে

জনম জনম গেলো বিরহ শোকে...

বধু কোন আলো লাগলো চোখে...

কি নাম দিব

মেইলঃ kinappi@yahoo.com

মুঠো ডরা বোদ

## মেয়ে

আকাশ এসে বললো, ওরে মেয়ে  
সবটুকু নীল তোর উপরে ফেলবো আমি ছেয়ে।  
বৃষ্টি এসে বললো, ওরে মেয়ে  
কুল ছাপিয়ে ছুটবো যে তোর বুকের নদী বেয়ে।  
মাটি এসে বললো, ওরে মেয়ে  
ভালোবাসায় উঠছি কেঁপে পরশটি তোর পেয়ে।  
জ্যোসনা এসে বললো, ওরে মেয়ে  
নিশুত রাতে আদর নিয়ে থাকবো আমি চেয়ে।  
সাগর এসে বললো, ওরে মেয়ে  
ভালো লাগার ঢেউগুলো সব তোর দিকে যাক ধেয়ে।

মহাবিশ্ব

ই-মেইলঃ [gb.ncsm@gmail.com](mailto:gb.ncsm@gmail.com)

মুঠো ডরা বোদ



## তপু আর তিতির নিতান্তই দুই..... অবুঝ কিশোর কিশোরী

১.

তপু আর তিতির। ১৮ বছরের কিশোরকিশোরী।-

তপুর মত ইমোশোনাল ছেলে তিতির কি কখনো দেখেছে ? এতবড় একটা ছেলে  
কিভাবে বাচ্চাদের মত এত কাঁদে !

তপুও কি তিতির এর মত ভয়ংকর সুন্দর কোনো মেয়ে কখনো দেখেছে ? সে  
তার নাম দিয়েছে মোমের পরী। গালটায় হাত ছোঁয়ালেই যেন গলে গলে পড়বে  
!

সেই বাচ্চা ছেলেটা তার মোমের পরীকে চিঠি লেখে। মোমের পরীও চিঠি দেয়।

বাস্তব যেমন ইমোশোনাল মানুষগুলোর জন্য বড় বেশি নিষ্ঠুর তেমনি আমাদের  
গল্পেও তপু খুব একটা মুখ্য না।

তিতির লেখে.....

“.....তুই নাকি তুমি করে বলব বুঝতে পারছি না আমার মনে হয় তুই করে !  
বললে সব freely বলা যাবে। সে যাই হোক, একদিন না একদিন তো তুমি করে  
বলতেই হবে। তুমি দিয়ে শুরু করছি।

তিতির নামের মেয়েটা তোমাকে অনেক কষ্ট দেয় তাই না ? এমন কি'বা কষ্ট  
দেয় যা কিনা তুমি সহ্য করতে পার না ? 'কেন আমাকে এত কষ্ট দাও'...এই  
বাক্যটা প্রতিনিয়ত আমাকে শুনতে হয়। আমি কি তোমাকে খুব বেশি কষ্ট দেই  
? আর যেটা তোমার উপর মানসিক ভাবে প্রভাব ফেলে এত সহজ সরল কেন !

তুমি? মন কে কি একটু শক্ত করা যায় না ? আর এ রকম সোজা টাইপ হলে  
তো খুব স্বাভাবিক একটা কথাকেও অস্বাভাবিক মনে হবে। হ্যাঁ আমি জানি তুমি  
আমাকে খুব খুব খুউউউউউউউউউউউভালোবাসো। প্লিজ আবারো বলছি  
মনটাকে একটু শক্ত কর। আরো একটা বাক্য আমাকে সবসময় শুনতে হয় ,  
'কেন আমাকে বুঝতে চাও না'। এটা কি আমার শুনতে খুব বেশি ভাল লাগে ??  
আমি তোমাকে বুঝতে চাই না তুমি কি মনে কর আমি তোমার অনেক দূরের !!  
কেউ ? তাহলে কেন আমাকে এ কথাটা বারবার শুনতে হয় ? তোমার মনে হয়  
আমি তোমার কথা শুনি না আমি কি আর কয়েকটা ছেলের সাথে প্রেম করি !

মুঠো ডরা বোদ



নাকি যে ওদের কথা শুনব ? তর্ক তো অনেক করলাম। আর ভালো লাগছে না এই ধরনের কথা বলতে।

মাঝে মাঝে খুব কষ্ট লাগে যখন ফোন করে তোকে পাই না। তোর সাথে কথা বলতে পারি না। তখন তোকে খুব খুব মিস করি। আর বসে বসে তোর কথা ভাবি। Sorry, ভুলে আমি তুমি না বলে তুই করে বলে ফেলছি হি হি হি। যখন !

ফোনে কথা বলার সুযোগ থাকে কিন্তু তোমাকে পাই না কিংবা তুমি অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাক রাগে তখন ইচ্ছে করে যখন তোমার সাথে দেখা হবে তখন আরো বেশি বেশি করে কষ্ট দিব। আমার সবচেয়ে বেশি কষ্টের দিন যেদিন তুমি আমার সাথে কথা বলনি সেদিন। ওই যে ওইদিন , মনে আছে? সেদিন আমি কিন্তু ঠিকই হলুদ জামাটা পড়ে এসেছিলাম , কিন্তু তুমি কি করলা?? আর সবচেয়ে বেশি আনন্দের দিন যেদিন তোমার সাথে রিকশায় ছিলাম কিছুক্ষনের জন্য কেন ওইদিন একটু করে হাতটা ধরলা না !? ভীতু কোথাকার হি হি ! হি। তোমাকে মাঝে মাঝে আমি বলি আমি তোমাকে কম ভালোবাসি। আর তুমি আমার কথা বিশ্বাস করে মুখটা ভারী করে ফেল। তখন কিন্তু আমি তোমার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকি যা তোমাকে বুঝতে দেই না !

ওই ফোলা গাল দুইটা দেখতে কি যে ভালো লাগে !! আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি সেটা তুমি আদৌ জান না। আমি বলি আমি তোমাকে কম ভালবাসি শুধুমাত্র তোমার গাল ফোলানোটা দেখার জন্য। আর তুমি তাই বিশ্বাস কর ! তোমাকে রাগাতে আমার এত ভালো লাগে !

তোমার প্রতি এখন একটা বিশেষ অনুরোধ , বৃষ্টিতে কখনো ভিজবে না। তুমি যখন বল ‘আজকে আমি বৃষ্টিতে ভিজছি রাত্রে জ্বর আসার জন্য ’ জান তুমি তখন আমার কত খারাপ লাগে ?? তোমার কষ্ট লাগলে তুমি বৃষ্টিতে ভিজ এটা আমি বিশ্বাস করি। তখন বৃষ্টিতে ভেজা ছাড়া কি আর কিছু মাথায় আসে না ? আমার সাথে আনন্দের দিন গুলোর কথা মনে করবা। দেখবে নিজেকে কতটা হালকা হালকা মনে হচ্ছে। আরো একটা অনুরোধ করব , সেটা হচ্ছে Please একটু Seriously পড়াশুনা কর, প্লিইইইজ। যাতে ভালো একটা রেজাল্ট করতে পার। আর সেটা হবে আমার জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট। আমি তখন সবাই কে গর্ব করে বলতে পারব।

সবশেষে একটি কথা বলব ..... I love you soooooooooooooooooo much.

(পুনশ্চ: লেখক চাইলেই তিতিরের কাঁচা আবেগের কথাগুলোতে খানিকটা পরিপক্বতা এনে দিতে পারতেন। কিন্তু তিতির তো ঠিক এভাবেই তপুকে

মুঠো ডরা বোদ



কেমন আছ? এই মুহূর্তে খুবই জানতে ইচ্ছে করছে। প্রতিটা মুহূর্তে তোমাকে ভীষণ মিস করি। আমার তোমাকে তপু নাম ধরে ডাকতে বেশি ভালো লাগে। কিন্তু আমি আমার নামটা তোমার মুখ থেকে খুব বেশি শুনতে পাই না। যখন তোমার কোনো চিঠি আমাকে দাও কেবল তখনই তাতে তিতির নামটা ধরে ডাক। বাকিটা সময় সেটা কোথায় হারিয়ে যায় ? কিন্তু আমার তো তিতির নামটা তোমার মুখ থেকে খুবই শুনতে ইচ্ছে করে ঠিক ! আছে এখন না ডাক বিয়ের পর তো ঠিকই তিতির তিতির বলে ডাকতে হবে , তখন ?

শুধু তোমার কথা মনে পড়ছিল। তুমি স্যারের বাসায় আসবে আর আমাকে ! দেখবে না আর তুমিও কষ্ট পাবে। সেদিন আমার জ্বর ছিল। তারপরও ভাবলাম ! চলেই যাই। ওর সাথে দেখা হলে আমার মন এম্মিতেই ভালো হয়ে যাবে। আমি যে আসব সেটা আমি নিজেও আগে থেকে জানতাম না। আর তাই তোমাকেও বলা হল না। কিন্তু যখন আসলাম তখন দেখি তোমাকে এত সুন্দর লাগছে যে আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না !! বিশেষ করে অফ হোয়াইট শার্ট টা পড়াতে। কিন্তু তোমাকে কথাটা বলা হয়নি। আমার একটাই সমস্যা , আমি সবকিছু তোমার মত খুলে বলতে পারি না। যখন প্রাইভেট শেষে বাসায় আসলাম তখন মনে মনে বলছিলাম ছেলেটাকে আজ কি যে সুন্দর লাগছিল ! কিন্তু ওতো জানতো না আমি আসব , তাহলে কেন ও ওই শার্ট টা পড়ে আসল ? অন্য কোনো মেয়ে যদি ওর দিকে তাকাতো মার সত্যিই খুব খারাপ লাগতো তখন।



আমি যে তোমাকে কম ভালোবাসি তা নয়। কিন্তু ভালবাসাটা হয়ত তোমার মত প্রকাশ করতে পারি না। এটাই আমার সবচাইতে বড় দুর্বলতা । তোমার ভালবাসায় কোনো ঘাটতি নাই। সব ঘাটতি আমার। আমার সবকিছু তোমাকে প্রকাশ করতে পারি না। সত্যি আমি খুব দুঃখিত আমার এই খারাপ অভ্যাসটার জন্য। আমি বুঝতে পারছি এটাই তোমাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়। তোমার চিঠিটা পড়ে তোমার জন্য খুব খারাপ লেগেছে। এই চিঠি লিখার সময় আমার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছিল। এখন এই কথাটা বললাম তাই বলেও কি তুমি কষ্ট পাবে ? এ জন্যই তো তোমাকে কিছু বলি না। তুমি তো একেবারে পিচ্চি বাচ্চার মত। ভেউ ভেউ করে শুধু কাঁদ ! আমাকে যে বল কান্না করো আমার কি খুব ভালো লাগে শুনতে ? তোমার এসব কথা শুনলে আমার তো ইচ্ছে করে তোমাকে জড়িয়ে ধরে আমিই সারাদিন কান্না করি ভবিষ্যতে ! তোমার যে কি হবে আমি ভেবে কূল পাই না এমনওতো একটা সময় আসতে ! পারে যখন আমরা একজন আরেকজনের চেয়ে অনেক দূরে থাকবো সেই ! ধরনের সময়ের জন্যওতো আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে তাই না? আমি যতটা কষ্ট পাই ততটা আমি দেখাতে পারি না। কিন্তু আমি তো সারাজীবন তোমাকে ভালবাসবো। এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একটা দিনের জন্য , একটা মুহূর্তের জন্যও আমি তোমাকে ভুলে থাকতে পারবনা। এই বিশ্বাসটা যদি তোমার মনের ভেতর থাকে তাহলে কিসের এত ভয় তোমার ? আমি আমার সব বাকবীকে সবসময় বলি, তপু তো আমাকে পাগলের মত ভালবাসে। আমি কখনো কল্পনাও করিনি একটা ছেলে আমাকে এত ভালবাসবে কি ভাবে সম্ভব ! ? এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া তোমার কাছ থেকে। আমার আর কিছু লাগবেনা।

তুমি যে লকেটটা আমাকে দিয়েছ সেটা আমার ভীষণ ভীষণ পছন্দ হয়েছে। মানুষটা যেমন সুন্দর তাঁর চয়েজটাও তেমন। লকেটটা যদি তুমি নিজের হাতে আমাকে পড়িয়ে দিতে তাহলে আমি আরো বেশি খুশি হতাম। শোনো , তুমি আমাকে না বলে কিনে ফেলেছ তাই আমি নিয়েছি। কিন্তু আর কিছু কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে নিছি না , যতক্ষণ না তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছ। হয়তবা অনেক কিছু দিতে ইচ্ছে করবে কিন্তু শুধু শুধু টাকা নষ্ট করার কোনো দরকার নেই। খবরদার আমার Birthday Gift এর নাম করে হাবিজাবি কোনো টাকা খরচ করবে না। আমি কিন্তু খুব রাগ করবো।

দেখলে, একটু লিখবো চিন্তা করে কলম নিলাম এখন থামতেই ইচ্ছে হচ্ছে না ! আজ আর বলবোনা। আর শোনো , পাঁচ ওয়াক্ত নামায শুরু করেছ না ?

মুঠো ডরা বোদ



একেবারে অন্তর থেকে আল্লাহ কে বলবে যেন এই তিতির তার পাগলা জামাইটাকে নিয়ে শেষদিন পর্যন্ত সুখে থাকে। নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিবে। নিজে মজা করে করে দিনে তিনবার গোসল করে হাঁপানি বাঁধিয়ে আমাকে কষ্ট দিবে তাই না ? ঈদে কোনো ধরনের Cold Drinks/Ice Cream খেয়ে যদি কাশি বাঁধাও তাহলে আমি তোমার অবস্থা বারটা বাজাবো !  
আর শেষ কথাটাতো তুমি জান তাই না লক্ষীসোনা ????? বলতো সেটা কি ?????  
”

(পুনশ্চও : পাঠকও হয়তো এক অবোধ কিশোরীর এই কাব্যের বিশালতায় লেখকের মতই বিরক্ত লেখক এখানেও অপারগ তিতিরের ভালবাসার ! কথাগুলোতে সংক্ষিপ্ততা আনতে। আর সবচেয়ে বড় কথা তপু কিন্তু এই চিঠি হাতে পেয়ে ভাবছিল, এই মেয়েকে কি আরো দুটো লাইন লিখতে পারতোনা ??)

“ওহ তপুউউউউউউ,

কতদিন পর তোমার সাথে দেখা হলো অনেকক্ষণ থাকতে পারলাম তোমার !!! সাথে থাকতে পারলাম। আমার তো একটুও ইচ্ছে করছিলো না তোমাকে ছেড়ে আসতে। বাসায় আসার পর থেকেই খুব খুব মিস করছি তোমাকে। আসলে এত বেশি খারাপ লাগছে কারণ অনেকদিন পর অনেকক্ষণ তোমার সাথে থাকতে পারলাম। আগে তো কলেজ ছিল তাই অপেক্ষা ছিল শুধু একদিনের। আর এখন আবার কখন একটু সুযোগ আসবে সেই আশায় আজ থেকে বসে আছি। তুমি যে বললে সোমবার আবার আসার জন্য আমি কিন্তু চাইলেই হ্যাঁ বলতে পারতাম। তারপরো কেন রাজি হলাম না জানো ? শুধুমাত্র ওই জায়গাটায় বসতে হবে বলে। আগेतো কলেজ ছিল তাই ওখানে চাইলে সারাদিন বসে থাকতে পারতাম। কিন্তু এখন উনি কি ভাববেন ? উনি হয়তো কিছু বলবেন না, কিন্তু তারপরো আমাদের নিজেদেরতো একটু বোধবুদ্ধি থাকতে হবে তাই না ? সেজন্যই আমি তোমার অনুরোধটা রাখতে পারিনি তুমি হাজার বলা সত্ত্বেও। তুমি প্লিজ রাগ করোনা। তুমি কি ভাবছো আমি ইচ্ছে করে আসতে চাইছি না ? তুমি তো এমনটাই ভাববে আমি জানি। কিন্তু আমি কেন না বললাম এটাওতো তোমাকে বুঝতে হবে। মেনে নিতে হবে বাস্তবটাকে। এই ব্যাপারটির

মুঠো ডরা বোদ



জন্যও যদি আমার সাথে রাগ করো তাহলে তো হবে না। শুধু অনেক ভালবাসতে জানলে কি চলবে ? Compromise, Understanding ব্যাপার লোওতো থাকতে হবে তাই না ? তুমি আমাকে বুঝবে আমি তোমাকে বুঝবো। এমনটাই তো ভালবাসা কে শক্ত করবে !

তপু, ওইদিন তোমার কথা শুনেতো আমি অবাক হয়ে গেছি আমার তপু এত ! সাহসি হয়ে গেল কখন ? সত্যি জানো মনের ভেতর এখন থেকেই ভয় ঢুকে গেছে আসলেই কি তুমি যা ! বলছো তা কি করতে পারবো ? আমাদের ভাবনার মত সব সহজ হবে ? কিন্তু সময়গুলোতো দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে আমার ! এমনকি নিপা যে অমন ভাবে ! তো এত সাহস নেই বাসা থেকে বের হয়ে গেল এমন কিছু করতে হলেতো আমি ভয়েই মরে যাবো আমার খুব ! ভালো লেগেছে তুমি আমাকে বলেছ আমরা নিপার মত কিছু করবোনা কখনো। মনের ভেতর সাহস আনার চেষ্টা করি যে , নাহ আমাদের অমন কিছু করতে হবে না। আমি বাসায় সব কিছু ম্যানেজ করে ফেলতে পারবো। কিন্তু সত্যি কথাতো তুমি জানো, নিপা কিংবা ঝুমুরের মত আমার ফ্যামিলি এত লিবারেল না। এসব যখন ভাবি তখন অনেক কু চিন্তা মাথায় আসে। যে বাসার অবস্থা কেমন হবে , আশ্রুরতো নিশ্চয় আমার কথা শুনে হার্ট এটাক হয়ে যাবে আর আবুর সামনে ! কথা বলার বিন্দুমাত্র সাহসও আমার কোনোদিন ছিল না। কি করবো আমি ?

অনেক সময় ভাবি , মানুষ কিভাবে ৫ বছর , ৭ বছর প্রেম করে কিভাবে !!! এতদিন অপেক্ষা করে থাকে আমারতো মনে ! আমারতো এখনি ভয় হচ্ছে !! হয় আমি এতদিন থাকতে পারবো না এখনো মাত্র দেড় বছর হচ্ছে। !

আমাকেও যদি এতটা বছর অপেক্ষা করে থাকতে হয় তাহলে তো আমি মরেই যাবো ইচ্ছে করছে কি জানো !!, এখনই বিয়ে করে ফেলি আমারতো আর !

সহ্য হচ্ছে না। কখন তোমাকে একেবারে সারাজীবনের মত পারবো ? এভাবে দেখা না করে কথা না বলে থাকতে থাকতে বুকের ভেতর জমাট বেঁধে যায়। খুব কষ্ট হয় নিজেকে সামলাতে। খুব খুব মিস করি তোমাকে।

তোমার শেষ চিঠিটা পড়ে মনে হলো , তোমার কি খুব বেশি ইচ্ছে করে আমার গাল দুটো ছুঁয়ে দেখতে ? আমার ভয়ে সাহস পাও না ? ঠিক আছে, আবার যখন দেখা হবে তখন তোমার এই সামান্য ইচ্ছেটা আমি পূরণ করবো। তবে আর কোনো দুষ্টোমি চলবে না ঠিক আছে ??

যখন ঘুমাতে যাই তখন আগের কথা গুলো খুব মনে পড়ে। কতবার সারারাত কথা বলে রাত পার করেছি তাই রাতে খুব ! কতদিন আগের মত কথা হয়না !

মুঠো ডরা বোদ



বেশি মিস করি। শোনো আমার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবে । ভালো করে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিবে। নিজের শরীরের প্রতি আমার হয়ে যত্ন নেবে , আমি যেহেতু আগের মত ফোন করার সুযোগ পাইনা তাই ঠিক আগে আমি যেমনটা বলতাম ঐ ভাবে চলবে। আমার জন্য নিজেকে সবসময় সুস্থ রাখার চেষ্টা করবে। মিস করবে কম পরিমাণে যাতে চিন্তা কম হয়, পড়াশোনার ক্ষতি নাহয়। মনে সাহস রাখবা আমি যতদূরেই থাকি শুধু তোমাকেই ভালবাসবো এবং তোমারই থাকবো।

----তিতির (i miss you....i miss you.....miss you.....সারাদিন বললেও বোঝানো যাবে না কতটা মিস করি! )

### উপসংহার

অনেক দিন পার হয়েছে। কত বছর হবে ? সাত বছর ? তপু Facebook এ কিছু পেইজ খুঁজে পায় যাতে ভালবাসার গল্প , চিঠি পাঠায় পেইজের Follower রা, Admin রা তা পেইজে Post করে। তপুর খুব ভালো লাগে পড়তে , Comment গুলোও ভালো লাগে।

এই ভাললাগা থেকেই তপুর এত বছর পর তিতিরের চিঠিগুলোর কথা মনে পড়ে। মার্ক জুকারবার্গ এর এই দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের কোনো এক ভীড়ে হয়ত তিতিরেরও একটা আইডি আছে। তপু ঠিক জানেনা , তিতির আসলে কেমন আছে সেটাও সে জানেনা। কখনো কি সে ভেবেছিল তিতির কে ভুলে থাকার অভ্যাস তাকে করতে হবে ? নাহ, তিতিরকে সে ভুলে যেতে পারেনি, শুধুমাত্র ভুলে থাকাটা অভ্যাস করে নিতে হয়েছে। এই অভ্যাসটা করতে তপুর নষ্ট করতে হয়েছে অনেক গুলো বছর , অনেকগুলো নিরু্ম বীভৎস ভয়ংকর রাত। এই তপু আর কাঁদে না। এই তপুর আর তিতিরকেও খুব একটা মনে পড়ে না। বাস্তবে আসলে এমনটাই ঘটে। বাস্তবের শেষটা কি কখনো সিনেমা, নাটক, উপন্যাসের মত এত সুন্দর হয় ??

তপু তিতিরের চিঠিগুলো বের করে ধুলো পরিষ্কার করে। তিতির কথা রাখতে পারেনি। কিংবা হয়ত তপুই পারেনি কে পেয়েছে কে পারেনি এই হিসেব তপু ! আগেও মেলাতে চেয়েছিল। আর প্রতিবারই মনে হয়েছে কতই না ছেলেমানুষ ছিল তারা কিন্তু তাদের ! প্রতিটা অনুভূতি কি আজ যতটা মূল্যহীন মনে হচ্ছে আসলেই এত মূল্যহীন ছিল ??? তিতিরকে আজ হঠাৎ খুব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, “ তিতির এই চিঠিগুলোতো ! তুমিই লিখেছিলে তাই না ? ”

মুঠো ডরা বোদ

তপু চিঠিগুলো পড়তে শুরু করে। রাত অনেক হয়ে গেছে। এত বছর পর কেন আজ তিতিরকে এত মনে পড়ছে ? এক সময় কত রাতই তো কেটেছে শুধু তার কথাই চিন্তা করে তপু ! অনেক বদলে গেছে , হয়ত তিতিরও। তারপরও সেই তিতিরের জন্য আরেকটা নির্ঘূম রাত নাহয় পার হলেই !

নাহিন আজিম

ইমেইলঃ [nahin\\_azim@yahoo.com](mailto:nahin_azim@yahoo.com)

মুঠো ডরা বোদ



## তুই নেই তাই !

ওই দিনগুলো, আর রাতগুলো  
 আর জলে-ভেজা হাতগুলো  
 আর তিনগুলো, আর সাতগুলো  
 আর অবুঝ আত্মসাৎগুলো  
 আর অপচয়ের খাতগুলো  
 আর নষ্ট বলের ঘাতগুলো  
 ওই ঘাত আর প্রতিঘাতগুলো  
 খুব দেরী-হওয়া রাতগুলো  
 আর প্লেটে-ঢাকা ভাতগুলো  
 আর মাছরাঙা প্রভাতগুলো  
 আর গোলাপ ফুলের জাতগুলো  
 খুব জাত-চেনাবার জাতগুলো;  
 তোর কিল-পাকানো হাতগুলো  
 তাই 'পালাই পালাই' রাতগুলো  
 আর ব্যথা পাবার দাঁতগুলো  
 'তুই জিতলে বাজিমাৎ'-গুলো  
 সেই ঘাত আর প্রতিঘাতগুলো  
 আর সয়ে যাওয়া ধাতগুলো  
 খুব সয়ে যাওয়া ধাতগুলো...

ওসব ছাড়া পারছি না আর,  
 সত্যি বলছি -  
 ওসব ছাড়া যাচ্ছে না আর থাকা...

মুঠো ডরা বোদ

## পাগলী

তোর খেয়াল-খুশি-  
অভিমনে,  
কালচে তারার লালচে গানে  
সুর মেলানো সেই পাখিটা  
হারায় তোর সুখে...

তোর অবহেলার  
বিকেলগুলো,  
'নোনা-সুখ'-এর সপ্ন মেখে,  
আলসেমি আর দুষ্কৃমিতে  
লুকায় তোর বুকে।

তবু যে তোর দিন কাটেনা  
রাত আসেনা  
ঘুম জাগেনা  
অন্ধকারে ছন্দ মেলায় না  
তোর কবিতা।।

তোর রাতের আলোয় সপ্ন  
বোনা  
দিনের কালোয় কষ্ট গোনা

অভিমানের স্পষ্ট সুরে  
তোর গাওয়া সেই গান-

তোর চোখের জলের শিশিরে  
ভিজে  
আলতো হাতের স্পর্শে নেচে  
তোর বুকেরই গভীর মায়ায়  
ভোর খুঁজে পায় প্রাণ।

তবু যে তোর দিন কাটেনা  
রাত আসেনা  
ঘুম জাগেনা  
অন্ধকারে ছন্দ মেলায় না  
তোর কবিতা।।

তুই বাষ্পায়িত ঝাপসা  
চোখে,  
থাকিস চেয়ে আকাশ-পানে  
অপেক্ষায় আর অভিমনে,  
নিশ্চুপ, একা....

শাহেদ খান

ই-মেইল: shahed\_04me@yahoo.com

মুঠো ডরা বোদ





## কল্পলোকের কল্পকথা

রাসেল।। ভার্শিটিতে পরিচয়। অনেক ভাল মনের একটা ছেলে। আর ভাল মনের মানুষজন তার চারপাশের মানুষগুলোকে খুব সহজে আপন করে নেয় এবং তাদের মধ্যে ভালোর বীজ বপন করে দেয়। সেই ক্ষেত্রে তার আশে-পাশের মানুষগুলোকেও ভাল বলা যায়। এই সূত্র ধরলে আমিও ভাল মানুষের কাতারেই পরি। কারনটা বলতে গেলে ,রাসেল ছিল আমার ভার্শিটি লাইফের সব চেয়ে কাছের বন্ধু। অর সাথে আমার লাইফের এমন কোন অধ্যায় নেই, যা শেয়ার করা হতো না। অর ক্ষেত্রেও একই, অর জীবনের প্রতিটি ঘটনার সাথে আমি পরিচিত।

আজ চার বছর পর শপিং করতে গিয়ে হঠাৎ ই অর সাথে দেখা হয়ে যায় । সাথে ছিল ভাবী আর একটা ফুটফুটে মেয়ে , অবিকল পুতুলের মত। তাই হয়ত সখ করে বাবা-মা পুতুলের মত মেয়েটির নাম রেখেছে পুতুল। অনেক আহ্লাদ করে তাকে, রাসেলের মুখ থেকে পুতুল-সোনা নামে ডাকতে শুনলাম। কত আদর করেই না বাবা-মা তাদের সন্তানদের ডাকে। হয়তো সন্তানরা তা উপলব্ধিও করতে পারে না।

৪ বছর আগে ফিরে গেলাম এক পলকেই।।। সদা হাসি-খুশি থাকা রাসেলটা কেমন যেন ক্লাসে গোমড়া মুখ করে বাসে থাকত। কাউকে কিছুই বুঝতে দিত না। কেন যেন অকে অনেক বেশি চিন্তিত লাগছিল কিছুদিন যাবত। তাই আমি আর দেরী সয়তে পারলাম না। অই পিরিয়ড শেষ হতেই কেফের সামনে নিয়ে অর কাছে কি হয়েছে অর, তা জানতে চাইলাম। ও নাছোড় বান্দা কিছুতেই মুখ খুলতে রাজি না। এই অজুহাত , সেই অজুহাত দেখিয়ে প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চাচ্ছিলো। আমিও কম যাই না। আমার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেলো , আমি বললাম দোস্ত, ঠিক আছে বলতে হবে না। যাইরে দোস্ত ,তোকে অনেক আপন

মুঠো ডরা বোদ

ভাবতাম, কিন্তু আসলে আমি মানুষ চিনতে ভুল করি। এই বলে যেই , পা  
বাড়ালাম সামনের দিকে , তখনই পিছন থেকে রাসেলের ডাক , এই তুষার  
কোথায় যাচ্ছিস ,দাঁড়া বলছি। আমি তো মহা খুশি। ভাবলাম আমার ডোজে  
কাজ হয়েছে। আমি অনেকটা মন খারাপের ভান করে দাঁড়িয়ে রইলাম । পাশে  
এসে রাসেল আমাকে একটা ঘুসি দিয়ে বলল , আমার না বিয়ে ঠিক হয়ে  
গেছে। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ কলির সাথে। আমি অকে  
ফিরতি একটা ঘুসি দিয়ে বললাম ,এই খুশির খবর বলতে তোমার এত গা  
জ্বলে কেন? বজ্জাত ছেলে। দাঁড়া সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি। এই বলে দিলাম  
একটা দৌড় ক্লাসের দিকে। আর পিছন থেকে রাসেল চিৎকার করে বলতে  
লাগলো, খবরদার কাউরে বলবি না। তাহলে কিন্তু আমার ইজ্জতের ফালুদা  
হয়ে যাবে।

সেই বছরের অক্টোবর মাস।।। লেভেল-৪ এর টার্ম-২ শেষ হল , কিছু দিনের  
জন্য হলেও পড়ালেখা স্তগিত। বাকী পড়ালেখা দেশের বাইরে থেকে করতে  
হবে। রাসেলকে ইদানীং খুব বেশি রকম উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। সামনেই যে অর  
বিয়ে, তাও আবার অর ভালবাসার মানুষটার সাথে।

কলির সাথে রাসেলের দীর্ঘ ৪ বছরের প্রেম। ভার্শিটির প্রথম লেভেল থেকেই  
অর সাথে কলির সম্পর্ক। কলি হোমইকোনমিকস কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র।  
আর রাসেল যেহেতু বুয়েটে পড়ে তাই তাকে আজিমপুরে শিফট করতে হয়।  
কলিদের বাসা আর রাসেলদের বাসা কাছাকাছি হওয়াই প্রায়ই অদের দেখা  
হতে থাকে, এর পর তা ভাললাগা থেকে কবে যে ভালবাসায় রূপ নেয় তা  
কারোরই জানা নেয়।

জানুয়ারি মাস।।। জোরে সোরে বিয়ের শপিং করা শুরু হয়ে গেছে। রাসেলের  
তো দেখা পাওয়াই যেন , আকাশের চাঁদ কাছে পাওয়ার মত। বেচারী ব্যস্ততা

মুঠো ডরা বোদ





আর কাজের চাপে একদমই শুকিয়ে যাচ্ছে। কলিকেও তেমন সময় দেয় নে শয়তানটা। একদিন কলি ফোন দিয়ে অর নামে কত অভিযোগ করল!!!

জানুয়ারি ৩০ তারিখ।।। আজিমপুরের ব্যস্ত রাস্তা ধরে হাটছিল কলি। কি এক কাজে যেন কলেজে আসতে হয়েছিল। বাসায় ফিরেছে, রাস্তা পাড় হতে গিয়েই বেচারির জীবনের সব চেয়ে কালো অধ্যায়ের সূচনা হল। কোথেকে যেন একটা মাইক্রো এসে ঠোকে দিয়ে গেল তাকে , আর সাথে সাথে তার ভাগ্যে রেখে গেল নির্মম কিছু পরিহাস।

ফেব্রুয়ারি ২ তারিখ।।। ঘুম ভাঙল কলির। ঘুম কিনা বলতে পারছে না। মাথায় প্রচণ্ড ব্যাথা। মাথাটা কোন মতে কাত করে তাকিয়ে দেখলো ,তার হাত ধরে মা বসে আছে। মনে হচ্ছে জনম-জনম ধরে আগলে রেখেছে থাকে। মেয়ের চোখ খুলতেই মার মুখে হাসি ফুটে এলো। কলি কিছুতেই তার পা দুইটা নাড়াতে পারছে না। কি যেন তার পায়ে ভর দিয়ে রেখেছে। মনে হচ্ছে একটা পাহাড় সমান বোঝা তার পায়ে কেউ চেপে রেখেছে । ব্যাথাটা আরেকটু প্রখর হওয়াই আবারও ঘুমিয়ে পড়ল কলি।

ফেব্রুয়ারি ২,বিকাল ৫ টা।।। কলি বুঝতে পারল যে তার ভাগ্যে আর বিয়ে লেখা নেই। তার ডান পাটা ঐ দুর্ঘটনায় দারুন ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় হাঁটুর নিছ থেকে কেটে ফেলতে হয়। সে জানে যে ,তাকে বাকিটা জীবন পঙ্গু হয়েই বাচতে হবে। চোখের কোটলি থেকে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পরতে দেখা গেলো।

ফেব্রুয়ারি ৪।।। রাসেলদের বাসা থেকে তার মা এসে কলিকে দেখে যায়। আর যাওয়ার সময় বলে যায়, রাসেল আর কলির বিয়ে হওয়া এখন আর সম্ভব না। এই বলেই রুমের বাইরে পা বাড়িয়ে চলে গেলো। কলি মার হাতটা

মুঠো ডরা বোদ

অসহায়ের শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো। কিছু যেন তার মনটা বলতে চাচ্ছে , কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছে না। হয়ত বলতে চাচ্ছে , মা এর চেয়ে মরে গেলেই হয়তো ভালো হতো।

ফেব্রুয়ারি ১৪।।। খুব সকাল রাসেল হাসপিটালে। মা খাবার আনার বায়না করে বাইরে চলে গেছে। রাসেলকে দেখে কলি খুব খুশি হয়ে কান্না কান্না কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো , কেমন আছো তুমি ? নতুন বউ দেখতে কেমন ? নিশ্চয় অনেক রূপবতী। তোমার বিয়ে হয়ে গেলে না , নতুন বউটাকে আমার কাছে নিয়ে এসো , আমি অকে একটু আদর করে দিবো। সে না খুব বেশি লাকি হবে। আর শোন , তোমাকে না কখনই একটা কথা বলি নি , আর হয়তো বলার সুযোগ হবে নাহ , তুমি না অসম্ভব রকম ভাল একটা ছেলে , অনেক বেশি কেয়ারিং। তোমার বউটাকে সুখে রেখো। এই কথাগুলো বলতে বলতে গাল বেয়ে বেয়ে অশ্রুর ফোটা বেয়ে পরে বিছানা ভিজে গেছে। রাসেল এতক্ষণ পর মুখ খুলল , পাগলী তোমার কি সব কথা বলা শেষ ? শেষ হয়ে গেলে তারাতারি উঠো, রেডি হতে হবে না? তুমি না রেডি হলে আমাকে বিয়ে করবে কে? তখন কিন্তু রাস্তা থেকে মেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে হবে। রাসেলের কথাগুলো বুঝতে কলির মনে হয় একটু বেশিই সময় লেগে গেল। সে রাসেলকে বলল , এই তুমি কি আমাকে একটা বার চিমটি কাটবা? রাসেল তার পাগলীর গায়ে জোরে চিমটি কেটে বলল , কি স্বপ্ন দেখছো নাতো?

রাসেল তাকে গাড়ি করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। আজ যে অদের বিয়ে। শক্ত করে রাসেল কলির হাতটি ধরে কানের কাছে ফিসফিস করে বলছে , মনে আছে পাগলী, তুমি বলেছিলে তোমার হাতটা কখনো না ছাড়তে , আমি না ছাড়ি নি। কখনো ছাড়বোও না। আই লাভ ইউ পাগলী।

মুঠো ডরা বোদ



অই তুয়ার, কি ভাবতেছিস? আচমকা রাসেলের কণ্ঠ কানে আসলো। কিছু না দোস্ত। কেমন আছিস ? -ভাল আছি রে। তুই কেমন আছস ? -আমিও ভাল আছি দোস্ত। তোর তো কোন খবরই নাই। ভাবীকে নিয়ে কবে দেশে ফিরলি??? -এই তো দোস্ত খুব বেশি দিন না ,মাস খানেক হবে। জানিস ,তোর ভাবীর পা না ঠিক হয়ে যাবে , লেগ ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমে। আমার স্পেনের কিছু ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ হইছে। ওখানে নাকি প্রথমবারের মত সফল ভাবে লেগ ট্রান্সপ্লান্ট সম্পন্ন হয়েছে। -হাসি ভরা মুখে আমি বললাম , অনেক খুশির খবর শুনালি দোস্ত। আর ভাবী আমি অত্যন্ত দুঃখিত এতক্ষণ আপনার সাথে কথা না বলার জন্য। কেমন আছেন ভাবী ? -এইতো ভাইয়া ,ভালো আছি। আপনি সময় পেলে কিন্তু বাসায় চলে আসবেন। আমাদের জন্য না হলেও আমাদের এই পুতুলটার জন্য হলেও অন্তত একবার আসবেন। -আচ্ছা ভাবী,অবশ্যই আসবো। আপনি না বললেও আসবো। পরে আবার যেন না শুনতে হয়, এত ঘন ঘন কেন আসি? :D -না ভাইয়া,তা কেন হবে, এই কথা কখনোই আপনাকে শুনতে হবে না , আসবেন কিন্তু বাসায়। -আচ্ছা ভাবী,আসবো। আর রাসেল শোন , ভাবীর আর তাদের পুতুলটার যত্ন নিস। যাই রে দোস্ত, পরে কথা হবে।

যেতে যেতে পেছনে ফিরে তাকলাম , রাসেল দিব্যি খুশি মনে হইল চেয়ার ঠেলে ঠেলে বেরাচ্ছে , আর ভাবীজান এক দোকান থেকে আরেক দোকানে তার পুতুলটার জন্য জামা-কাপড় দেখেই যাচ্ছে।

একটি সত্য কাহিনী নিয়ে গল্পটি লিখা, তবে কিছুটা কাল্পনিকতার মিশ্রণে

Imran Taher

ই-মেইলঃ [imran.taher@yahoo.com](mailto:imran.taher@yahoo.com)

মুঠো ডরা বোদ



## তোমার জন্য ভাবনাগুলো মাঝে মাঝে কবিতা হয়ে যায়

তুমি যেখানেই রবে  
জেনে রাখো কন্যা  
সেখানেই আমার পদচিহ্ন।  
যেখানে তুমি  
হৃদয় মেলে দেবে সবুজ ঘাসে  
সেখানেই আমি আছি  
শুধু তোমার জন্য।

যেখানে তোমার খোলা  
আকাশের রঙ নীল  
সেখানে আমি রংধনু  
নানারঙ্গে বর্ণিল।

যেখানে তোমার সন্ধ্যা নামে  
সাথে নিয়ে জোনাকীর নাচানাচি  
তুমি জেনো, আমি ছিলাম  
আজো আছি, হৃদয়ের কাছাকাছি।

নিশাচর ভবঘুরে।

ই-মেইলঃ [rakib.haider2012@yahoo.com](mailto:rakib.haider2012@yahoo.com)

মুঠো ডরা বোদ



## বালিশ

ফ্লোরিডায় এলো আজ প্রায় ছমাস হল। রেবা প্রথমে সমস্যাটাতে খুব একটা গুরুত্ব দেয় নি। বড় ভাই কে যদিও বেলেছে তার সমস্যার কথা। ভাইয়া বলল, “নতুন জায়গা, পুরো ভিন্ন একটা দেশ, সব তর তরিকাই ভিন্ন। মানিয়ে নিতে একটু একটু সমস্যা হবে প্রথমে। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে- যাবে সময়ের সাথে সাথে।”

ভাইয়ারও নাকি একই সমস্যা হয়েছিল প্রথম যখন এসেছিল এখানে। ফ্লোরিডায় ভাইয়া এসেছিল প্রায় বিশ বছর হয়ে গেল। এদেশের নাগরিকত্ব পেয়েছে ইতিমধ্যে। বাড়ি করল , গাড়ি আছে , ফুটফুটে দুটি বাচ্চাও আছে। ফাতিমা আর ইব্রাহীম। নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য ভাইয়া কাগজের একটা বিয়ে করেছিল ভাবীর সাথে। তারপর ভাইয়ার ভাষ্য মতে , মেয়েটির প্রতি তার ভালোবাসা জন্মে যায় , মেয়েটিও তার ধর্ম ত্যাগ করে ভাইয়া কে মুসলিম রীতি মেনে বিয়ে করে। এদেশের অন্য অনেক বাঙালীর চেয়ে রেবার ভাবী অনেক বেশী মুসলমান অবলিলায় বাংলা বলতে পারেন ।বাঙালী-,নামায পড়েন, কি সুন্দর বাংলা গান গান। ছেলেমেয়েদের আর দশটা দেশি মায়ের মতন বড় করছেন, শাসন করছেন।

যদিও ভিনদেশী মেয়ে বিয়ে করেছে দেখে বাবা তাকে এক প্রকার ত্যাজ্য ই করে দিয়েছে। তাকে দেশে আসতে বারন করে দেওয়া হয়েছে। চলে যদিও আসে তবে বাবার বাসায় আসা যাবে না , বাবা তার মুখো দর্শনও করতে চান- না। মা এবং রেবা কেও বাবা বলে দিয়েছেন, তার জিবদোশায় যদি ভাইয়ার সাথে কেও যোগাযোগ করে তবে তিনি তাদেরকেও তার বাড়ি থেকে বের করে দেবেন।

মুঠো ডরা বোদ

রেবা বরাবরই ভাইয়া অন্তঃপ্রাণ। গোপনে ভাইয়ার সাথে তার প্রায়ই কথা হত ফোনে, এমনকি ভাইয়া দেশে আসলে তার সাথে রেবা দেখাও করত। মাঝে মাঝে মাও যেত। ভাইয়ার বাচ্চা গুলোর নাম দিয়েছিল মা ই।

আরও একটা মানুষের সাথে গোপনে কথা ও দেখা করতো রেবা। মারুফ। ভার্শিটির ফাস্ট ইয়ার থেকে ওদের ভাব। প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেল ওদের সম্পর্ক। যদিও ভার্শিটির এমন কেও নেই যে, জানে না ওদের সম্পর্কের কথা। রেবাকে মারুফের বন্ধুরা ভাবী বলেই ডাকতো। প্রতিটা জায়গায় , প্রতিটা অনুষ্ঠানে ওরা একসাথে যেত , ফিরত। কি যে প্রেম , কি যে ভালোবাসা , অন্যসব জুটির জন্য রেবা ! মারুফ ছিল আদর্শ-মারুফের ব্যাংকে চাকরী হয়ে যাবার পর থেকেই রেবাকে ও বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। এর মধ্যে ভাইয়ার ঐ ব্যাপারটার কারণে বাবা পুরো বিগড়ে বসলেন। যদিও মারুফ সুপাত্রই ছিল। কিন্তু , কোন প্রেমের বিয়েতে উনি সম্মতি দেবেন না।

ভাই আর মায়ের সাপোর্ট এ অবশেষে রেবা বসন্তের একরাতে তার ঘর ছেড়েছিল মারুফের হাত ধরে। বিয়ে করল ওরা। কি সুন্দর কি ! সুখের সংসার - মায়া, কি আদর, কি ভালোবাসা, কি বিশ্বাস!

বাবার মনের বরফ গলতে দুবছর লাগলো। যখন তিনি দেখলেন , মারুফ আসলেই তার রেবাকে অনেক সুখে রেখেছে। একটা ফ্ল্যাট কিনল , গাড়ীও হল। অনেক ভালো আছে রেবা। সদ্য একটা চাকরীতে রেবাও জয়েন করল। মারুফ ই বলল , “সারাদিন বাসায় একা একা না থেকে কিছু একটা করো।”

ওদের সংসারের বয়স প্রায় পাঁচ বছর হতে চলল।

অফিসের কাজে রেবা খুলনা থাকবে তিনদিন। সব মিলিয়ে দশ বছর হবে ওরা একসাথে পথ চলছে। এই প্রথম রেবার মারুফকে ছেড়ে পুরো তিন তিনটে দিন থাকতে হবে রেবার কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। তাও যায় সে। !

মুঠো ডরা বোদ



দুদিনের মাথায় রেবাই আর সহ্য করতে পারেনা। চাকরী গেলে যাবে , তাও মারুফকে ছেড়ে ও আর এক দণ্ডও থাকতে পারছেননা। একদিন আগে এসে মারুফকেও একটা সারপ্রাইজ দেয়া হবে!

ঘণ্টা খানেক আগে মারুফ ফোন করেছিল ,” তুমি কোথায় ?”  
 “এইতো মিটিং শেষ করলাম। এখন রেস্ট হাউজে !” মারুফকে একটা সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য মিথ্যা বলেছে রেবা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বরং রেবা তাদের বাসায় ফিরবে।

“তুমি কি করো?”

“আমি তো অফিসে, কামলা খাটি।”

“ওকে বাই।”

“বাই।”

বাসায় পৌঁছাতে প্রায় সাতটা বাজে। মারুফ এই সময় আসে না অফিস থেকে। তাই দরজায় কলিং বেল না দিয়ে নিজের কাছে রাখা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খুলে ঘরে ঢুকে রেবা।

রেবার পুরো ব্যাপারটা দুঃস্বপ্ন লাগে বিশ্বাস হতে চায় না। কোন হেলুচিনেশন ! ঐ নগ্নতা ! কোন ভ্রম ! হবে নির্ঘাত, বিশাসঘাতকতা, ওটা মারুফ নয়। তার মারুফ হতেই পারে না এত দিনের ভালোবাসা তাদের !, এত এত মায়া , ভালোবাসা, বিশ্বাস, সুখ দুঃখে তারা একসাথে হেসেছে ওটা তার !কেঁদেছে - যে রেবার স্পর্শ ছাড়া মারুফের ঘুম আসে না !মারুফ নয়, মেয়েটির সাথে ঐ নগ্ন লোকটি তার মারুফ নয়!!

ভাইয়ার সাথে ফ্লোরিডায় আসার পর থেকেই রেবার ঘুম হচ্ছে না প্রতিরাতে ! রেবা ছটফট করে, এপাশ ওপাশ করে পুরো রাত-, কিন্তু ঘুম আসে না !প্রায় ছমাস হল। ঘুমের ওষুধ খেলে কিছুটা ঘুম হয় , কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার জেগে ওঠে। সবাই বলছে , নতুন জায়গায় আসলে নাকি এরকম হয়।

মুঠো ডরা বোদ

একদিন রাতে হঠাৎ ভাবী এসে রেবাকে জিজ্ঞেস করে ,”তোমার খাটে মাথার বালিশগুলো কই? দেখছি না যে?”

“আমি তো বালিশে ঘুমাতে পারি না।”

“মানে? কি বলতা কি করে হয় !? তবে মাথা কোথায় রাখো? এজন্যই তোমার ঘুমের সমস্যা হচ্ছে!”

“ভাবী, আমি না ঘুমানোর কাজে কখনও বালিশ ব্যবহার করতাম না তার !  
! দরকারই হতো না। আমি একটা মানব শরীরের উপর মাথা রেখে ঘুমাতাম  
!বড় বিশ্বস্ততায় !বড় নিশ্চিন্তে”

বলতে বলতে চোখে পানি আসে, গলা ধরে যায় রেবার।

কেও তার বিশ্বাস তখনই করেছিল, ভালবাসাকে হত্যা করেছে বলেও নয়। তার মাথা রাখার এত পুরনো , এত দিনের আশ্রয়টা হঠাৎ এক ঝড়ে ও হারিয়ে ফেলেছে বলে রেবা ঘুমাতে চায় !, কিন্তু ঘুমাতে পারে না বলে কাঁদে রেবা !  
!!কাঁদে তার মাথার বালিশের জন্য

মাহমুদা সোনিয়া

ই-মেইলঃ [mahmudasonia@yahoo.com](mailto:mahmudasonia@yahoo.com)

মুঠো ডরা বোদ



## অর্ণব আর আমি

“কেন চলে গেলে দূরে, হারিয়ে মনের সুরে” - একটি লাইনই বার বার লিখে চলেছি আমি। ডায়েরীর পাতাটা চমৎকার , আজিজ সুপারের গ্রাসহোপার দোকান থেকে কেনা। ভীষন ভালো লাগে আমার ওদের পাতার মাঝে নাক ডুবিয়ে লিখতে। ঝাঁকুনিতে লেখা ঐকে বেঁকে যাচ্ছে , কিন্তু আমাকে সে খামতে দিচ্ছে না। সে মানে অর্ণব , আমার মালিক। মালিক কথাটা শুনে কি সচেতন পাঠকের ভুরু একটু কুঁচকে গেলো? শব্দটা এই জমানায় প্রাচীন বলে বিবেচিত হয় বটে , কিন্তু শব্দের ব্যবহার ঠিকই আছে। আঙ্কেল টমস কেবিনের যুগের সাথে এ যুগের পার্থক্য তো শুধু বাইরের আবরণে। রঙিন পর্দার ঝালরটা সরালেই সব এক। অর্ণবকে আমি মাঝে মাঝে মালিক বলি , কারণ ওর যা ইচ্ছা সে তাই আমাকে দিয়ে লেখায়। মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করতে মন চাইলেও আমি চুপ করে থাকি । ছেলেটাকে আমি ভীষন পছন্দ করি। অর্ণব আমাকে বলে তার আত্মার বন্ধু। তার সব কথা সে আমাকে বলে; সব গোপন কথা, সারাদিনের যত জমানো কথা।

অর্ণবের সাথে আমার প্রথম দেখা হয় স্কুলের মাঠে। ধবধবে সাদা শার্ট , নেভি ব্লু প্যান্ট আর ছোট টাই পড়া একটা ছেলে অর্থাৎ আমাকে তাকিয়ে দেখছে- দৃশ্যটা এখনো আমার চোখে ভাসে। দুইজনেই ছিলাম একেবারে যাকে বলে ন্যাদা বাচ্চা , আর তাই ভাব করতে বুড়ো আঙ্গুল ঠেকানোরও দরকার হয়নি। আমাদের বয়স বাড়লো বটে , কিন্তু অর্ণবের বাচ্চাটে ভাব আর গেলো না। আর তাই অর্ণবের প্রতি আমার স্নেহের ভাবটাও কিছুতেই দূর হলো না। ছেলেটা পাগল আছে। পাতার পর পাতা ডায়েরী লেখে , কবিতায় কবিতায় ঘরের দেয়াল ভরায় ; আবার মৌমিতার সাথে ঝগড়া হলেই সব লেখা লাইটারের আগুনে পোড়ায়। লাইটারটাও মৌমিতারই দেয়া। সেসময় অর্ণবকে আমার ভয়াবহ লাগে। শক্ত হয়ে যাওয়া চোয়াল আর ক্ষুদ্র চোখের দৃষ্টি দেখে আমি গুটিয়ে যাই। লেখা নয় , যেন তার ভিতরের ক্ষোভগুলোকে পোড়ায় সে। মৌমিতার সাথে ঝগড়া মিটে গেলেই আবার সব ঠিক। কাঁদো কাঁদো মুখে সে আমাকে নিয়ে লিখতে বসে আধপোড়া ডায়েরীর ছেঁড়া পাতায়। অনেক কালি ব্যয় করে তার অনুশোচনা আর কষ্টের গল্প লিখতে।

মুঠো ডরা বোদ

অবশ্য ২৩ বছরের একটা ছেলে , যে নিজেকে কবি এবং প্রেমিক বলে দাবী করে; তার কাছ থেকে আর কি আশা করা যায়?

অর্ণব লেখে। সে যদি লেখাগুলো সবাইকে পড়তে দিতো , হতে পারতো সে অনেক বড় কবি বা লেখক। কিন্তু সে লেখে শুধু মৌমিতার জন্য। মাঝে মাঝে কোন লাইন পড়ে আমার নিজেরই মন কেমন করে ওঠে। দুঃখ হয়। আমি তো কখনো পারবো না আমার প্রেয়সীকে নীল খামে সবুজ পাতায় এই লাইন লিখতে। কখনো চিৎকার করে বলতে পারবো না , “জান শোনো, তোমার জন্য বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে আনবো আমি ১০৮টি নীল পদ্ম। ” কিন্তু অর্ণব পারে। এই যেমন এখন এই মুড়ির টিন বাসের মধ্যে দুপুরের ভ্যাপসা গরমে ঘামতে ঘামতে সে কবিতা লিখছে। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি , মৌমিতার জন্মদিন উপলক্ষে লেখা এই কবিতা কি মৌমিতার মনকে টানতে পারবে ? অর্ণব গত মাসে দুইটা টিউশনির সাথে আরেকটি এক্সট্রা টিউশনি নিয়েছে , দুপুরে এখন শুধু ভাত আর ডাল খায় , হেঁটে টিউশনিতে যায়- সব মৌমিতার জন্য। রাইফেলস স্কয়ারের এক দোকানের নেকলেস দেখে মৌমিতা আবদার করেছিলো, গত মাসেই। অর্ণবের বাচ্চা বাচ্চা মুখটা শুকিয়ে কি অদ্ভুত মায়া মায়া দেখাচ্ছিলো তখন। বুকের মাঝে ধুকধুকানি বেড়ে গিয়েছিলো। আমি টের পেয়েছিলাম, তখন আমি ওর বুকের কাছাকাছিই ছিলাম যে । মৌমিতা অন্যায়াভাবে অবুঝ হবার সব ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। কখনো তার চোখে পড়ে না যে কম খেয়ে খেয়ে অর্ণব শুকিয়ে যাচ্ছে, কখনো বোঝার চেষ্টা করে না যে অর্ণব নিজের খরচ চালিয়েও বাসায় টাকা পাঠায় তার ছোট বোনের পড়াশোনা চালাবার জন্য। গত ঈদে মৌমিতা ১০ হাজার টাকার “আঁচল” কামিজ কিনেছে, আর মাত্র ১৫ হাজার টাকার জন্য অর্ণবের মা চোখের ছানি কাটা অপারেশনটা পিছিয়ে দিয়েছে। হয়ত দামী সানগ্লাস চোখে থাকে বলেই মৌমিতা দেখেনা। কিংবা আমি অর্ণবের আত্মার বন্ধু বলেই আমার চোখে জল আসে। এরপরেও অর্ণব মৌমিতাকে ভালোবাসে , ভীষন রকম ভালোবাসে। মৌমিতার ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করাকে ভালোবাসে। ভালোবাসার প্রতিক্ষায় থাকে শান্ত ছেলেটা।

মুঠো ডরা বোদ



পড়াশোনা আর টিউশনি চালাতে গিয়ে অর্ণব সময়ের অভাবে লিখতে পারছিলো না। আমি বুঝি , এই জন্য কিছু বলি না। বাসের মাঝেও লিখতে দেই তাকে। বাসের অবস্থা অবশ্য ভালো না , ৫-৭ জন লোক বাতুড়ঝোলা হয়ে আছে। বাসের ভিতরে দম ফেলার জায়গা দেই। আর ড্রাইভার নিজেকে পাইলট ভাবছে। এসি গাড়িতে করে প্রতিদিন ক্লাসে আসে মৌমিতা। আর অর্ণবকে বকা দেয় , কেন এসব বাসে চড়ে সে জীবনের রিস্ক নিচ্ছে। ফেসবুকে নাকি প্রতিদিনই মানুষজন রোড অ্যাকসিডেন্ট নিয়ে ক্ষুদে বার্তা দেয়। অর্ণব শুধু হাসে , রাগে গা রি রি করে আমার। এরকম একটা মেয়েকে অর্ণব কেন ভালোবাসবে ? অর্ণব লেখা থামাতেই আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। নিশ্চই স্টপেজ এসে গেছে। অর্ণবের প্রতিটি নড়া চড়া আমার চেনা। এখন সে “ভাই সরেন তো। ইশ , একটু জায়গা দেন ” এসব বলতে বলতে ধাক্কা ধাক্কা করে বাস থেকে নামবে। এরপর শাহবাগের ফুলের দোকানগুলোর সামনে গিয়ে রিকশা নেবে। প্রতি সোম আর বুধবার অর্ণবের এটা রুটিন। গুলশানে ছবির মত একটা বাসায় পুতুলের মত একটা বাচ্চা মেয়েকে সে পড়াতে যায়। বাচ্চা মেয়েটা আমাকেও অনেক পছন্দ করে। প্রায়ই সে তার স্যারের কাছ থেকে আমাকে নিয়ে তাল গাছের কবিতা লেখে। তুয়ানা আজকেও কবিতা লিখেছে, তাই মনটা আমার ভালোই।

ধাক্কাধাক্কি আমার খুবই অসহ্য লাগে। অর্ণব তার মানিব্যাগ সামলে রেখেছে কিনা এসব টেনশনও মাথায় আসে। আজকাল তো পকেট মারের অভাব নেই। বাস থেকে নামতেই আমি শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঁকি দেই। ঐ তো ফুলের দোকানগুলি , রিক্সা সংখ্যা একটু কমই মনে হচ্ছে। অর্ণব এক হাতে তার ব্যাগ আর আরেক হাতে আমাকে ধরে রাস্তা পার হতে থাকে। এক মূহুর্তের জন্য আমার মনে হয় আমার জগত স্থবির হয়ে গেছে , সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে যায়। ট্রাফিক পুলিশের হাতকে অগ্রাহ্য করে একটা বাস যে তীব্রগতিতে আসছে তা কি অর্ণব দেখেছে? বাসটাকে আমার জলজ্যান্ত দানবের মত মনে হয়, দানবের স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে বুদ্ধিহীন এক পশু। অর্ণবকে সতর্ক করার জন্য চিৎকার দেবার জন্য মুখ খুলি , কিন্তু তীব্র ঝাঁকুনিতে সব এলোমেলো হয়ে যায়।

মুঠো ডরা বোদ

কয়েক মাস পরের কথাঃ

সবকিছু এখন কেমন যেন এলোমেলো লাগে। নতুন কোনকিছুই আর মনে রাখতে পারিনা। ঐদিন মনে মনে যে লেখা লিখছিলাম, সেটাই বার বার ভাঙা রেকর্ডের মত গুন গুন করে যাই। শুধু অর্ণবের চেহারা চোখের সামনে ভাসে। এলোমেলো কবিতা , গান আর ভয়ংকর কিছু কথা ভাসে। একা একা থাকলেই উত্তেজিত কণ্ঠের চিৎকারগুলো কান ঝালাপালা করে দেয়। “অ্যাম্বুলেন্স, অ্যাম্বুলেন্সে খবর দাও কেউ ”, “ঢাকা মেডিকলে নিয়ে চলো ”, “ভাঙ গাড়ি”, “ছেলে তো স্পট ডেড”, “ইশ, ছেলেটা তো একেবারে বাচ্চা”- এজাতীয় চিৎকারে গা শিউরে ওঠে আমার। প্রাণপণে অনুনয় করতে থাকি আমি, প্লিজ কেউ আমাকে নিয়ে কাছে রাখো ; একজন অন্তত একটা কবিতা লেখো। কেউ আসে না। টেবিলের এক প্রান্তে অবহেলায় পড়ে থাকি আমি। আমাকে গৃহকর্ত্রীর প্রয়োজন হয় শুধু সকাল বেলায় , যখন কর্তা বাজারে যান। যত্ন করে তিনি আলু , পেঁয়াজ আর শশার হিসাব লেখেন আর দামের উর্ধ্বগতি নিয়ে রাগারাগি করেন। অনেক কাল হয়ে গেলো , কোন নতুন কবিতার লাইন আমি শুনিনা। অন্ধকারে যখন একা থাকি , তখন মনে মনে “তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে ” ছড়াটা বার বার আবৃত্তি করি। সেই ছোট্ট বেলায় অর্ণব যখন আমাকে প্রথম কুড়িয়ে পায় , খাতা খুলেই এই ছড়াটাই লিখেছিলো। নিচে লিখেছিলো, আমার কলম আমার বন্ধু।

উৎসর্গঃ মৃত্যুফাঁদ নামে পরিচিত শাহবাগ মোড়টাকে। না চাইতেও কিছু মাখামোটা এবং পশুপ্রবৃত্তির মানুষের কারনে কত অজস্র স্বপ্নের অপমৃত্যুর সাক্ষী হয়ে আছে রাস্তাটা।

ত্রিনিত্রি

ই-মেইলঃ [trinitri17@yahoo.com](mailto:trinitri17@yahoo.com)

মুঠো ডরা বোদ



## রোদের পরে মেঘ কেঁদেছে, ইচ্ছে তোমায় ছুটি

(১)

ভার্সিটিতে একটি গুজব ছড়িয়েছে। গুজব শব্দটি শুনলে কেমন যেন সিক্রেট কিছু মনে হয়। গুজব শব্দের আভিধানিক ইংরেজি হচ্ছে রিউমার। রিউমার শব্দটার সাথে টিউমার শব্দটার দারুন মিল। টিউমার শরীরের কোন অংশে ছোট আকারে শুরু হয়ে যেমন ধীরে ধীরে বড় এবং শেষে ক্যান্সারে রূপ নেয়, তেমনি রিউমার একজন থেকে অন্যজনে ছড়িয়ে শেষে ভয়াবহ রূপ নেয়। তবে টিউমার যথেষ্ট সময় নিলেও রিউমার ভীষণ অধৈর্য, অল্প সময়ে ব্যাপক ছড়িয়ে যায়। এই যেমন ধরা যায় প্রধান মন্ত্রীর পি এস সাহেব ফার্মেসীতে যেয়ে বলবেন যে প্রধান মন্ত্রীর কষা, ডোজ লাগবে। দেখা যাবে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে শহরে ছড়িয়ে পরেছে প্রধান মন্ত্রীর এই ঘটনা। কোন কোন পত্রিকা বড় করে শিরোনাম লিখে ফেলবে, "মৃত্যু পথযাত্রী প্রধানমন্ত্রী....." টেলিভিশনের রিপোর্টার একটি জরিপ দেখিয়ে বলে দেবেন তামাম দুনিয়ার কয়জন প্রধানমন্ত্রী বাথরুম কষা হওয়ার কারনে মারা গেছেন। শহরের অলি গলি রাজপথে এই বাথরুম কষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ শুরু হয়ে যাবে। বিরোধী দলের প্রধান বিশ্বস্ত সূত্রে খানায় খবর নিবেন যে এই কষা হওয়ার জন্য দায়ী করে তাদের নামে খানায় মামলা এসেছে কি না। দেশের বিজ্ঞানী শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা গবেষণা শুরু করবেন এই কষা প্রাকৃতিক নাকি কৃত্রিম, এমন কি তারা মলমুত্রের স্যাম্পল চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর দরখাস্ত করে বসবেন। হুমায়ুন স্যার এই টপিক পেয়ে একটি বই লিখে ফেলতে পারেন যার নাম হবে, "প্রধানমন্ত্রীর কষা এবং মিসির আলির পায়জামা" যদিও পাঠক এই ঘটনায় মিসির আলির মত রহস্য সমাধানদাতার ভূমিকা কি তা লেখায় বুঝতে পারবেন না। জাফর স্যারও আমাদের হতাশ করবেন না নিশ্চয়ই, এই নিয়ে সায়েন্টফিক কিছু অবশ্যই আমরা আশা করতে পারি।

মুঠো ডরা বোদ

অনেক হয়েছে, এবার আসল ঘটনায় যাই। ভার্শিটিতে গুজব ছড়িয়েছে যে আমি নাকি ক্লাসের জ্বালাময়ী সুন্দরী নাহ জ্বালাময়ী শব্দটা অশ্লীল শোনায়, আমি নাকি ক্লাসের সবথেকে রূপবতী এবং বড়লোক বাপের কন্যা নীনার সাথে প্রেম করছি। কেউ কেউ নাকি এর প্রমাণ দিতে পারবে বলে দাবী করছে। ক্লাসের সফিক হারামজাদা দাবী করছে আমাকে আর নীনাকে নাকি সে লিটনের ফ্ল্যাটেও যেতে দেখেছে। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার না হলে আমার একহাত দেখে নেবে বলে নাকি নীনার মজনুরা হুমকিও দিচ্ছে। কিন্তু এতকিছু ঘটে গেছে সেটা আমি নিজেও জানি না। চারদিন ক্লাসে আসিনি, আজ এসে নিজের গার্লফ্রেন্ড মিমির কাছে এসব শুনছি। মিমির প্রেমিকের নামে এত কিছু ছড়াচ্ছে আর এই মেয়ে এসব আমাকে বলছে আর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে আমার উপরে। পৃথিবীর রহস্যময় চরিত্রগুলোর মধ্যে মিমি একটি। সে নীনার মতই অত্যাধিক সুন্দরী হলেও আমার কাছে একটু বেশী। নীনার থেকে কোন অংশেই কম নয় মিমি। বিয়ের সময় মেয়ে দেখতে গেলে বলে হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান হয় না, একদিক থেকে না একদিক থেকে ঘাটতি থাকে। কিন্তু মিমির বেলায় পাঁচটি আঙ্গুল সমান, সে দেখতে যেমন সুন্দরী, তেমনি তাদের অবস্থা অন্যসব দিকও দারুন। মিমি আমার দুই ইয়ারের জুনিয়র। মিমির সাথে প্রথম পরিচয়ের পর্বটা বলি,

একদিন মিমির গাড়ির চাকা দেবে গেছে। আমি মধ্যবিত্ত বাবার ছেলে, তাই রিকশাই সম্বল। রিকশা নিয়ে বাড়ি যাব তখনি রাস্তায় একটি মেয়ে ডেকে উঠলো,”এই যে ভাইয়া শুনুন প্লিজ, একটু হেল্প লাগবে” সুন্দরী মেয়েদের মুখে ভাইয়া ডাক শুনলে গা জ্বলে তবুও রিকশা চালককে থামাতে বললাম। নেমে মিমির সামনে দাড়লাম। মিমি বললো,”আমার গাড়ির চাকা দেবে গেছে, আমি কি রিকশাটা নিয়ে যেতে পারি?” এই বেলায় এই এলাকাতে রিকশা তো দূরে থাক ঠেলাগাড়িও পাওয়া যাবে না। তাই মিমিকে বললাম,”আমি কি সাথে আসতে পারি? এখন রিকশা পাওয়া যাবে না, তাছারা আমার একটু তাড়া আছে।” মিমি রিকশায় উঠে বললো,”স্যরি

মুঠো ডরা বোদ



ভাইয়া, আমি পুরুষের ঘামের গন্ধ সহ্য করতে পারি না, আপনার গা থেকে গন্ধ আসছে। এই রিকশা তুমি যাও ।“ রিকশা চলে গেলো আর আমি হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই প্রথম কেউ বললো আমার গা থেকে ঘামের গন্ধ আসছে, অপমান করলো নাকি? কোন মেয়ের এতখানি স্পর্ধা নেই আমাকে এসব বলবে। কিন্তু এই মেয়ে অবলীলায় বলে চলে গেলো? গা থেকে তো ফরাসি সৌরভের ঘ্রান আসছে, ডেনিমের একটা সুগন্ধি পাঠিয়েছে এক বন্ধু।

পরদিন ক্লাসের শেষে ছাতিম গাছের নীচে বসে ভাবছিলাম পড়াশোনা শেষে বাবার ছোট ব্যাবসায় হাত দেব নাকি চাকরি বাকরি সন্ধান করবো। এমন সময়ে মিমি সামনে এসে বললো,”হা করে বসে আছেন কেন? ক্ষুধা লেগেছে?” বলেই খিল খিল করে হেসে ফেললো। এত হাসির কি আছে বুঝতে পারলাম না। কিন্তু এই মেয়ের হাসি সুন্দর। হাসলে দুই গালে টোল পড়ে। যেসব মেয়েদের গালে টোল পড়ে তারা মানুষকে দেখিয়ে হাসে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাসি প্রাকটিস করে কারন তারা জানে হাসলে তাদের সুন্দর দেখায়। “কি কাল আপনাকে চমকে দিয়েছিলাম না? আসলে আপনার গা থেকে ঘামের গন্ধ আসেনি, আপনাকে বোকা বানানোর জন্যে এসব করেছি।” বলেই আবার হাসতে লাগলো। মেয়েটি খুব চঞ্চল তাছারা হাসির রোগ আছে। দেখতেও সুন্দরী। সুন্দরী মেয়ে দেখলে আমার বুকে ব্যাথা করে, এই মেয়েকে দেখে বুকে ব্যাথা করছে, সুতরাং সে সুন্দরী। যাইহোক, এভাবেই আমাদের প্রেমের শুরু।

আমি মিমিকে বললাম,”আচ্ছা ভার্টিটিতে সবাই এসব বলাবলি করছে, তোমার কি একটুও জ্বলে না?”

“কেন? তোমার কি সত্যি সত্যি জ্বালাময়ী রূপবতী নীনা আপুর সাথে প্রেম হয়েছে নাকি?” আবারো হাসতে শুরু করলো ও, হাসতে হাসতে হেচকি তোলার উপক্রম।

মুঠো ডরা বোদ

“শোন মিমি, তুমি ভালো করেই জান আমি খুব সহজে রাগী না, আর তুমি আমাকে রাগানোর জন্য এসব বলছো তাও আমি জানি। শোন, ঐ নীনার নাম শুনলে আমার গ্রান্ডমাদার টাইপ মনে হয়। নীনা উল্টালে হয় নানী। ভীষণ হাস্যকর, তুমি কি করে ভাবলে ঐ গ্রান্ডমাদারের সাথে আমি প্রেম করবো?”

“মিমি নামটাও একটু চেঞ্জ করে দিলে মামী হয়ে যায়। কিছুদিন পরে তো তুমি আমাকে আন্টি টাইপ বলতে শুরু করবে।” বলেই আবারো বাচ্চাদের মত হাসতে শুরু করলো মিমি। মাঝে মাঝে মনে হয় এই মেয়ে মরা বাড়িতে গেলে হাসতে হাসতে শেষ হয়ে যায়, আর মূর্দা খাটিয়া থেকে উঠে কাফনের কাপড় ফাক করে বলে, “এই মেয়ে হাসছো কেন? দেখছো না আমি মারা গেছি। কাঁদো বেয়াদব মেয়ে”

উঠে ক্লাসের দিকে রওনা দিলাম। নীনার সাথে কথা বলা দরকার। এই মেয়ে যে ইচ্ছে করে এমন করেছে সেই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। বছর খানেক আগে ক্লাস ভর্তি স্টুডেন্ট এর সামনে একদিন প্রোপজ করে ফেললো। আমি কিছু না বলে বেড়িয়ে গেলাম ক্লাস থেকে। সেই থেকেই এই মেয়ে অদ্ভুত সব কান্ড করে বেড়াচ্ছে। একবার আমাদের বাড়িতে যেয়ে আমাদের কাছে বললো, “আন্টি আপনার ছেলে আমাকে বিয়ে করে ফেলছে।” আমরা মাথা ঘুরে পরে গেলো। এই মেয়ে নিজেই আমাদের মাথায় পানি ঢেলে ঠিক করে আসার সময় আমাদের বলে এসেছে, “আন্টি দুষ্টামি করলাম, দেখলাম আপনার মেন্টাল স্ট্রেস কতখানি।” সেদিন থেকে আমরা বলে দিয়েছেন, “তুই আমার সন্তান হয়ে থাকলে ঐ ডাইনীর ধারে কাছেও যাবি না”

ক্যাফেটেরিয়ায় দেখা হয়ে গেলো ডাইনী নীনার সাথে। দেশের কসমেটিকস ব্যবসার প্রসারের পেছনে ডাইনী নীনার বড় রকমের অবদান আছে।

মুঠো ডরা বোদ



পড়ালেখা শেষ করে যদি একটা কসমেটিকস এর দোকান খুলে বসি আর নীনার মত যদি দুই থেকে তিনটা “বান্ধা কাস্টমার” থাকে তাহলে দিব্যি সংসার খরচ উঠে যাবে। ডাইনী নীনা আমার খুব ভালো ফ্রেন্ড। তাই ওর সকল অত্যাচার চোখ, মুখ, নাক, কান সব বুজে সহ্য করতে হয়। একটা কফি সামনে নিয়ে সরু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডাইনী নীনা। সামনে যেয়ে বিরক্তি নিয়ে বললাম,”কিরে ডাইনী, কাহিনী কি?”

“তোকে না বলছি আমাকে ডাইনী বলবি না”

“কিছু করার নাই, মায়ের আদেশ”

“আন্টি আমাকে এই নামে ডাকতে বলছে?”

“আরে নাহ, আন্মা বলছে ডাইনী নীনার আশেপাশেও যাবি না”

“তাহলে তুই আসছিস কেন? যা মায়ের আচল ধইরা বইসা থাক গাধার বাচ্চা।”

গাধার বাচ্চা হচ্ছে নীনার ট্রেডিশনাল গালি। ফোন ধরার পরে ওপাশ থেকে কেউ যদি বলে “গাধার বাচ্চা” তাহলে বুঝে নিতে হবে নীনা আর যদি বলে “জানু” তাহলে বুঝে নিতে হবে মিমি আর কেউ যদি বলে “হারামির বাচ্চা” কিংবা “ইবলিসের বাচ্চা” তাহলে নির্ঘাত আন্মা আর যদি বলে “মাই লিটল ইয়াংম্যান” তাহলে তিনি আমার পরম পিতা মহীশুর । তাকে আমি আদি রাজাদের নামে মহীশুর উপাধি দিয়েছি। আমার সব থেকে ভালো বন্ধু এই “হারামি” অথবা “ইবলিস” আব্বু। সব ফ্যামিলিতে কর্তা থাকে বাবা আর আমাদের ফ্যামিলিতে আন্মা, আন্মার আচরন এমন যে আব্বু তার বড় ছেলে আর আমি ছোট, আন্মাজান রাজনীতিতে গেলে ভালো নাম করতেন, রাজপথে ভালো ফাইট করতে পারতেন। আর আমার বাবা হচ্ছেন সংসারের টাকা কামানোর মেশিন। মেশিনের পকেট থেকে টাকা বের হচ্ছে আর মেশিন চুপচাপ দেখে যাচ্ছে।

নীনার দিকে তাকিয়ে বললাম,”তোর সাথে জরুরী কথা আছে”

“এখন বলবি?”

মুঠো ডরা বোদ

“হুম এক্সুনি”

“আমি এখন তোর জরুরী কথা শুনতে পারবো না, আগে কফি শেষ হোক”

আমি কফি শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসে রইলাম। নিনা কচ্ছপের মত ধীরে

ধীরে কফি খাচ্ছে, দেখে ইচ্ছে করছে ওর মাথায় গরম কফি ঢেলে দিতে।

ঠিক পনের মিনিট পরে নীনা কফি শেষ করে বললো, “ কি বলতে চাস বলে

ফেল, তোর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আমার মাথায় গরম কফি ঢালার ইচ্ছে

করছে তোর”

“তুই বুঝালি কিভাবে?”

“আমি তোমার মাইন্ড রিড করতে পারি জানু”

“জানু? খবরদার তুই আমাকে জানু ডাকবি না, এইটা শুধু মিমির জন্যে”

“আচ্ছা সমস্যা নাই, মন, পরান, পাখি এগুলো ডাকবো, জানু আজকাল ক্ষেত

টাইপ হয়ে গেছে। তুই যেন কি বলবি বলেছিলি? তারাতারি বল, আজ

খাটাশের ক্লাস আছে”

“খাটাশ আবার কে?”

“রহমত আলী স্যার। তার নতুন নাম দেয়া হয়েছে খাটাশ , এখনো

এফিডেবিট করে নামটা রাখা হয়নি, তবে এই নামটা ছাত্রদের মাঝে ব্যাপক

জনপ্রিয়তা পেয়েছে। খাটাশ কি খায় জানিস?”

“না, জানার ইচ্ছেও নেই, এখন বল তুই এসব কি শুরু করেছিস”

“তেমন কিছু না, ইন্ডিয়া থেকে আমার এক খালু মুলতানি মাটি নিয়ে

আসছে, এগুলো মেখে রাতে ভূত হয়ে বসে থাকি দুই ঘণ্টা, তারপরে

ফেসওয়াশ দিয়ে ধুয়ে ফেলি”

“তুই আমাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করছিস? আমি বলছি তুই এসব কি কথা

ছড়াইছিস? আমি নাকি তোরে নিয়া লিটনের ফ্ল্যাট না সবুজের ফ্ল্যাটে

গিয়েছি? সফিক নাকি আবার প্রমান দিতে পারবে, এগুলো কি?”

“তুই বেকেলের মত কথা বলছিস কেন? একটি অবলা মেয়ে কি পারে তার

সম্বন্ধ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে?”

“আমি ভালো করেই জানি তুই এসব করছিস। আমার সাথে মিমির রিলেশন

জেনেও তুই এসব করছিস কেন? তুই কি আমার ভালো চাস না? এরপরে

মুঠো ডরা বোদ



এমন করলে তোর সাথে বন্ধুত্বের রিলেশনও থাকবে না, তুই ভালো কোন সাইকিয়াট্রিস্ট'র সাথে যোগাযোগ করা।”

“আমার কান্না পাচ্ছে, আমি কি কাঁদবো?”

“তোর যা ইচ্ছে তা কর, আমাকে আর বিরক্ত করিস না, তোর ঠ্যাং দুইটা দে ধরে মাফ চাই”

নীনা সত্যি পা এগিয়ে দিয়ে মিটিমিটি হাসছে। এই পাগলের সামনে বেশিক্ষন থাকলে ক্যাফেটেরিয়ার সবাই দেখবে একটি স্মার্ট যুবক ছেলে একটি ডাইনির পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। তাই বেড়িয়ে পড়লাম। খাটাশ, স্যরি রহমত আলী স্যারের ক্লাস করতে ইচ্ছে করছে না আজ। ইমনের কাছে যেতে হবে। ইমন আমার ছোট ফুপ্লির একমাত্র ছেলে। লাইফের ষোল নাম্বার ছাকা খেয়ে দুই দিন থেকে দরজা আটকে ঘরে বসে আছে। গুলশানারা ফুপ্লি ইমিডিয়েট ফোন করেছে কারন ও আমার কথা ছারা কারো কথা শুনে না। আমার ছোট ফুপা সোলাইমান শেখ খচ্চর টাইপের লোক। দুইটা দুই নাম্বারি ব্যাবসা চালায়। সোসাইটিতে দেখায় সে খুব দানশীল ভদ্রলোক। প্রথম জীবনে চর্মকার ছিলেন। চর্মকার বলে বাংলা কোন শব্দ আছে কি না জানি না, তবে যারা কর্ম করে তাদের কর্মকার বলে। তিনি প্রথমে চামড়ার দালালি করতেন, তাই তাকে চর্মকার উপাধি দেয়া যায়। যাইহোক, খচ্চরের বাচ্চাটা নির্ধাত দরজা আটকে গাঁজা টানতেছে। আমি না যাওয়ার আগে ঠিক হবে না।

(২)

ফুপ্লির বাসায় কলিংবেল বাজাতেই আজান শুরু হয়ে গেলো। বর্তমানে অদ্ভুত সব টিউন সেট করে কলিংবেলে। কখনো কুকুর ডাকে আবার কখনো ব্রিটনি স্পেয়ারস গান গায়। ফুপ্লির বাসায় বেলহুজুর সময়ে অসময়ে আজান দেয়। হুজুরের আজান শেষ হওয়ার আগেই দড়জা খুললেন গুলশানারা ফুপ্লি। প্রায় ছয়মাস পরে তার সাথে দেখা। এ কদিনে ফুলে ইয়া মোটা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে বিশাল কোন এক দৈত্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, যেকোন সময়

মুঠো ডরা বোদ

আমাকে তুলে আছার মারবেন। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, “কেমন আছো ফুশ্লি?”

“রিক তুই? আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না!”

“চিমটি কাটবা?”

“আগে ভেতরে আয়, দুপুরে কিছু খেয়েছিস?”

“হুম ক্যাফেটেরিয়াতে সিঙ্গারা খেয়েছি, তোমার পুত্রধন কোথায়?”

“আছে ওর ঘরে, তুই বাবা যেয়ে দেখ তো দড়জা খুলে কি না। আর শোন আমি তোর জন্য জাপানি নুডলস করতেছি, না খেয়ে কোথাও যেতে পারবি না।”

ফুশ্লির বাসায় আসা মানেই তার নতুন নতুন রেসিপি টেস্ট করা। জাপানি, ফ্রেঞ্চ, মেক্সিকান সব রকমের রেসিপি ট্রাই করান তিনি। ভাগ্যিস আজ সোমালিয়ান কোন খাবার রেসিপিতে নেই। অনেক আগে একবার ফুশ্লির মঙ্গোলিয়ান এক রেসিপি ট্রাই করে তিনদিন ICDDRБ তে ভর্তি ছিলাম। তারপর থেকে তার বাসায় খাওয়ার ব্যাপারে এক্সট্রা সচেতনতার আশ্রয় নিতে হয়। ইমনের ঘরে নক করে কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। বাইরে দাঁড়িয়ে ওর মোবাইলে একটা মেসেজ দিলাম, Open your gate, a strange treasure waiting for you.

সাথে সাথে দড়জা খুলে আমাকে জড়িয়ে ধরলো ইমন। আমি বললাম,

“কিরে খচ্চরের বাচ্চা কেমন আছিস?”

“ভাইয়া তুমি আসছ এতদিন পরে? ভেতরে আসো তোমার সাথে অনেক কথা আছে।”

“তোর বাপ কোথায়?”

“কে সোলাইমান ভাই? সে তো ব্যাবসার কাজে ঢাকার বাইরে গেছে।”

“তোর ভাই হলো কিভাবে? যাইহোক, ছাকা খাইছিস?”

“তুমি তো সবই জানো ভাইয়া, রিনা যে আমার সাথে এমন করবে কখনো ভাবি নাই।”

মুঠো ডরা বোদ



“এর আগের পনেরটা প্রেমের বেলাতেও ভাবিসনি, তোর গাঁজার পোটলা কোথায় রাখছিস?”

“ভাইয়া পুরা মাথা নষ্ট, এইবার বর্ডার থেকে পুরা কলির মাল ম্যানেজ করছি, তুমি টানবা?”

“বানা দুইটা, তার আগে তোকে জাপানি নুডলস খেতে হবে।”

মনোযোগ দিয়ে গাঁজা তৈরিতে ব্যাস্ত ইমন। আগে থেকেই কেটে কুঁচি কুঁচি করে রেখেছে। গোল্ডলিফের তামাকের সাথে মিক্স করলে নাকি এক্সট্রা পিনিক হয়। সিগারেটের ছোখা খালি করে তার ভেতরে নিপুন ভঙ্গিতে গাঁজা ঢুকাচ্ছে সে। দুইদিন হয়ত ঘুমায়নি, হাত কাঁপছে। এরই মাঝে দড়জায় নক করে জাপানি নুডলস দিয়ে গেছে কাজের মেয়ে। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বাতাসে জানালার পর্দা উড়ছে। ইমন বললো, “ভাইয়া রেডি হয়ে গেছে, সাথে লিকুয়িড কিছু খাবা?”

“লিকুয়িড কি আছে?”

“বাবার এক বস্তু জে ডি এনেছে বাইরে থেকে। একটা হাফ লিটার ইনটেক আছে।”

“আগে জাপানি নুডলস খেয়ে নে, তারপরে দুজনে ছাদে বসে খচ্চরের জিনিস খুলবো।”

বাচ্চাদের মত করে নুডলস খাচ্ছে ইমন। দেখতে মায়া লাগছে। দুইদিন এই ছেলে না খেয়ে পরে ছিল। খাওয়া শেষে সন্ধ্যায় ছাদে দুজনে লিকুয়িড আর তারপরে শুকনা টেনে ঝিম ধরে বসে রইলাম। ইমনের শেষ প্রেমের গল্পটা এমন, রিনাকে সে ভীষণ লাভ করতো, অবশ্য পূর্বের পনেরটি প্রেমের বেলাতেও একই কথা বলেছিল। ওর প্রেমের কাহিনী নিয়ে একটি মহাগল্প লেখা যাবে। কবিরী মহাকাব্য লিখে গেছেন, কিন্তু গল্পকারেরা মহাগল্প কেন লিখলেন না সেটাও একটা জ্বলন্ত প্রশ্ন মানে এ বারনিং কোশ্চেন। যাইহোক, রিনা ওকে ধোঁকা দিয়ে ওরই এক ফ্রেন্ডের সাথে রিলেশনে গেছে। আজকাল রিলেশন ব্যাপারটা ছেলেখেলা হয়ে গেছে। ফার্স্ট হ্যান্ড গার্লফ্রেন্ড, সেকেন্ড

মুঠো ডরা বোদ

হ্যান্ড গার্লফ্রেন্ড আরও কত কি। সেই শোক ভুলতে ইমন গাঁজা সেবন কে বিকল্প পদ্ধতি ভেবে নিয়েছে। একজন মানুষকে কোন কথা বুঝাতে হলে তার পরিস্থিতিতে যেয়ে বুঝানো সবথেকে উত্তম। একজন সাহিত্যিক অন্য একজন সাহিত্যিককে বুঝতে পারে, তেমনি একজন মাতাল অন্য একজন মাতালের কথা মনে গেঁথে নেয়। ইমন কে বাস্তব কিছু কথা বুঝিয়ে দিলাম, এবার কিছুদিন ও লাইফ নিয়ে ভাববে, যদিও পরে আবার প্রেমের সন্ধানে কবুতর সার্চ শুরু করবে। ইমনকে আকাশের তারাদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে আমি সোজা রাস্তায় নেমে রিকশা নিলাম। নইলে রাতে হয়ত ফুগ্লির উগান্ডা কিংবা কঙ্গোর রেসিপি টেস্ট করতে হবে।

রাতে এলকোহল খাওয়ার পরে রিকশায় চড়ার মজাই আলাদা। চোখ বন্ধ করে দুইহাত ছড়িয়ে বসে থাকলে মনে হয় এই পৃথিবী আমার রাজ্য। আমার রাজ্যের আমি রাজা আবার আমিই প্রজা। সারি সারি ল্যাম্পপোস্ট একের পর এক পাশ কাটিয়ে যায়। নিয়ন আলোয় সমস্ত শহর নতুন সাজে সামনে আসে। রিকশার গতির সাথে বাতাসের গতি বাড়ে। সেই বাতাস শরীরে আদর ছুঁয়ে যায়। শীতল বাতাস শুরু হয়েছে। বৃষ্টি নামতে পারে। রিকশার গতি এখন আরও বেড়েছে। প্রকৃতি চিৎকার করে ডাকছে তার বুকে মিলিয়ে যাওয়ার জন্যে।

সকালে ঘুম ভেঙ্গেছে ডাইনী নীনার ফোন পেয়ে। প্রতিদিন সকালে এই মেয়ে ফোন করে ঘুম ভাঙায়। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ফোন কেটে দিলে একের পর এক ফোন করে যাবে, আর মোবাইল অফ রাখলে মেসেজ দিতে থাকে, পরে মোবাইল অন করলে একের পর এক মেসেজ আসতে থাকে, মাথা পুরা আউলা হয়ে যায়। বাধ্য হয়েই ওর ফোন রিসিভ করতে হয়।

“হ্যালো!”

“মন, কেমন আছো তুমি?”

“ঢং করবি না একদম, কি জন্যে ফোন করছিস?”

মুঠো ডরা বোদ





“পরান পাখি আমার, তোমাকে কি আমি ফোন করতে পারি না। ঘুম কেন হলো?”

“মন পরান এইসব কি? সুস্থভাবে কথা বলতে পারস না?”

“আহ, তুই কি আমাকে সুস্থ থাকতে দিয়েছিস? ভালো কথা শোন, যার জন্যে ফোন দিয়েছি সেইটা বলি। আজ আমার মন খুব খারাপ, তুই আমাকে নিয়ে একটু ঢাকার বাইরে যাবি। আমি প্লেস ঠিক করে রেখেছি, গাজীপুরে আমার মামার একটা বাগানবাড়ি আছে। সেখানে যাব। আমি গাড়ি নিয়ে তোদের বাসার সামনে আসছি।”

“তোর কথা শেষ হয়েছে?”

“নাহ, আমরা সেখানে লাঞ্চ করবো, আমি স্টার থেকে লাঞ্চ আনতে পাঠিয়েছি। আর রাতের খাবারে...”

“থাম, আমি যেতে পারছি না, আমার কাজ আছে।”

“কি কাজ শুনি? তোর জি এফ মিমির পাও ধরে বসে থাকবি? গাধার বাচ্চা কোথাকার। রেডি হয়ে নে, আমি আসছি।”

ঝুলাম মহা বিপদে পরেছি। এক্ষুনি নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে। অনেকদিন মামুনের মেসে যাওয়া হয় না। আজ সেখানেই দিনটা পার করতে হবে। ডাইনী নীনা গাজীপুরে যাবে এর পেছনে কোন কারন নিশ্চয়ই আছে। সুস্থ কোন কারন ছাড়া এই মেয়ে কিছু করে না। তারচেয়ে মামুনের সাথে আড্ডা দেয়া যাক। আজ ছুটির দিনে আড্ডার আসর বসানো যাবে। অন্যসব বন্ধুরাও চলে আসবে। রাতে সোহরাওয়ার্দিতে কবিতার আসর জমজমাট হবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই খুব ভালো কবিতা লেখে। আমি নিজেও মাঝে মাঝে কবিতা লিখি, ফিজিক্সের ছাত্র হলেও কবিতা লেখার অভ্যেস আছে ছোটবেলা থেকে। গত ঈদসংখ্যায় একটি কবিতা এসেছিল আমার, তাও সব কবির শেষে শেষ পাতায়, আরেকটু হলে ঈদসংখ্যা থেকেই বেরিয়ে যেত। আসরে এই কবিতাটি সবাইকে কিছুটা সময়ের জন্যে শ্রদ্ধ করিয়ে দেয়,

এখনো তুমি ঘুমাও?

মুঠো ডরা বোদ

কতটা দিন গিয়াছে কাটিয়া  
দেখিনি তোমায় যতন করিয়া,  
আমাতে কিছু হইবে ভাবিয়া  
মরিতে শত মিছে কাঁদিয়া।

আজিকে কেন এত ভরা চাঁদ  
জোনাক জ্বলা আলো ছায়া রাত,  
দখিনা বাতাসে বিষাদের সূর  
বেলীর সুবাস ভাসে বহুদূর।

রাতের বেলায় ঘুমের ঘোরে  
পাশেই যখন হাতটি পড়ে,  
জাগিয়া দেখি তুমি সেথা নাই  
শুন্য এ'ঘর এই বিছানায়।  
এখনো কি তুমি ঘুমাও?

মামুনের ওখানে আর যাওয়া হলো না। বাসা থেকে বেড়িয়ে চোখ ছানাবড়া।  
ডাইনী দাঁড়িয়ে আছে। বুক ধক ধক করছে। স্নায়ুচাপ বেড়েছে, মস্তিষ্ক কোন  
কথা সাজাতে পারছে না। কোনমতে জিজ্ঞাসা করলাম, “তুই এখানে?”  
“হ্যাঁ মনপাখি, একঘণ্টা থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। আমি জানি আমার  
ফোন পেয়ে তুই পালাবি, তাই এখানে দাঁড়িয়ে তোকে ফোন করেছি। চল  
গাড়িতে উঠ।”  
“আমি দূরে কোথাও যেতে পারবো না, আজ শরীর খারাপ, তাছারা কাজ  
আছে।”  
“গাড়িতে উঠ গাধার বাচ্চা, আমি তোর শরীর ভালো করার ব্যবস্থা করছি।”

ওর সাথে বৃথা তর্ক করার মানে হয় না। দেখা যাবে চিৎকার চেষ্টামিচি করে  
রাস্তার কিছু মানুষ জরো করাবে। একজন রমণীর বিপদ ভেবে পাবলিক

মুঠো ডরা বোদ



উৎসাহের সহিত এগিয়ে আসবে। দেখা যাবে কেউ কিছু না বুঝে আমাকে কিল ঘুষি লাথি শুরু করবে। তারপরে একমাস পিজিতে পা ঝুলিয়ে বেড়ে শুয়ে থাকতে হবে। তারচেয়ে এই ডাইনীর কথা মেনে নেয়াই ভালো। গম্ভীর হয়ে বসে আছে নীনা। মন খারাপের অভিনয় করার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই পারছে না। মানুষের মন খারাপ হলে তার চোখ এবং তার আশেপাশে তার প্রতিফলন ঘটে। নীনার চোখ চকচক করছে। আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “তোর কি মনে হয় মিমি তোকে সত্যিই ভালোবাসে?”

“বোকার মত প্রশ্ন করছিস কেন?”

“আমি বোকা নই তুই ভালো করেই জানিস, শোন তুই যেহেতু একটা গাধা তাই ফ্রেন্ড হিসেবে তোকে সাবধান করাটাই আমার দায়িত্ব। মিমি আসলে তোকে ভালোবাসে না। তোর মত স্মার্ট আর বোকা ছেলে সে আর একটিও পাবে না। তাই তোকে হাতে রেখেছে। যখন তোর থেকেও ভালো কাউকে পাবে তখন তোকে ছেড়ে যাবে, এতটুকু নিশ্চিত থাক।”

“ছেরে গেলে যাবে, তখন তুই থাকবি, এত চিন্তার কি আছে?”

“তোর কি মনে হয়, ছ্যাকা খাওয়ার পরে আমি তোর সাথে রিলেশনে যাব? তুই যদি ছ্যাকা খাওয়ার আগে আসতে চাস তাহলে আমি রাজি আছি।”

“প্রেম করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে? যখন ছ্যাকা খাব তখন দেখা যাবে কি হয়। এখন বল আমরা কোথায় যাচ্ছি?”

“ভয় করিস না, তোকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি না, আগের প্ল্যান বাদ, এখন শপিং করবো। তুই পছন্দ করে দিবি।”

আসলে নীনার কথাই হয়ত ঠিক। মিমিকে আমি কখনো বুঝতে পারি না। এই মেয়ে নিজেকে সবসময় একটা রহস্যের মাঝে রাখতে পছন্দ করে। সেই রহস্য ভেদ করার ইচ্ছে থাকলেও আমি কখনই পারি না। মিমি অনেকটা মেঘের মত, ইচ্ছে করলে ঝরবে, আবার ইচ্ছে করলে ভেসে বেড়াবে। ওর ঘরের দড়জায় খিল দেয়া, শুধু জানালায় জোছনার আলো পরে। আমাবস্যায়

মুঠো ডরা বোদ

সেই আলোরও দেখা মেলে না। ঝাঁঝ পোকাক ডাক শুনে জানালা বন্ধ করে  
সে, অথচ শৃগালের ডাকে আনন্দে নেচে উঠে।

(৩)

মিমিদের বাড়ি গুলশানে। গুলশান-১ এ লেকের পাশে প্রকান্ত একটি দোতলা  
বাড়ি। মিমির দাদা এই বাড়িটি করেছিলেন আরও বিশ বছর আগে। পূর্ব  
দিকের বারান্দায় দাঁড়ালে লেকভিউ দেখা যায়। এই নিয়ে তৃতীয় বারের মত  
ওদের বাড়িতে আসতে হলো। বারান্দায় দুটো চেয়ার দেয়া আছে। মিমির বাবা  
শফিকুল ইসলাম ইক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসা করছেন। মনে হয় ভদ্রলোক  
রাতে এই বারান্দায় বসেন। বারান্দার এক কোণে বেনসন এন্ড হেজেসের  
একটি প্যাকেট পরে আছে। ভদ্রলোকের সিগারেটের আসক্তি আছে বোঝা  
যাচ্ছে। যদি একদিন মিমির বাবাকে বলি, “শফিক সাহেব, নিন একটা  
সিগারেট ধরান” ভদ্রলোকের চেহারা কেমন দেখাবে? ভাবতেই নিজ খেয়ালে  
হেসে ফেললাম। মিমি পেছন থেকে চা নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো, “হাসছো  
কেন?”

“নাহ এমনিতেই, তোমার বাবা সিগারেট টানেন?”

“না তো, কেন বলতো?”

“বারান্দায় একটি সিগারেটের প্যাকেট আছে, তাই বললাম।”

“মনে হয় হায়দার চাচা এসেছিলেন, বাবার বন্ধু”

“ওহ আচ্ছা, তোমার বাবার তো চলে আসার সময় হয়েছে, আমি এখন  
যাই”

“আগে চা খাও, আজ তোমাকে কেন ডেকেছি জানো?”

“ধারণা করতে পারছি, চাল ফিফটি ফিফটি”

“বলো কেন ডেকেছি তোমাকে?”

“তোমার বাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে। কি ঠিক বললাম?”

“হুম তুমি বুদ্ধিমান, আচ্ছা এবার বলো তোমার সাথে পরিচয়ের পরে বাবা  
তোমাকে নিয়ে কেমন ধারণা পোষণ করবেন?”

মুঠো ডরা বোদ



“তোমার বাবা আমাকে পছন্দ করবেন, কিন্তু আমাদের ফ্যামিলি সম্পর্কে শুনে তিনি তার ভুরু কুঁচকাবেন। আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিয়ে তোমাকে বলবে,”মিমি, তুমি একটু আমার ঘরে এসো তো, জরুরী কথা আছে।”

“তোমার সব ধারণা হয়ত সত্যি নয়, বাবা একজন চমৎকার মানুষ”

“তোমার বাবা চাইবেন তোমার স্বামী যেন ঘর জামাই থাকেন, কিন্তু এই ব্যাপারটা আমার কখনই পছন্দের না। সুতরাং তোমার বাবা তোমার হাত কখনই আমার হাতে দিবেন না। তুমি কি কাঁদছ মিমি?”

“নাহ, তুমি অনেক ইনটেলিজেন্ট।”

মিমির বাবার সাথে দেখা হলো । ভদ্রলোকের ব্যবহার সত্যিই দারুন। আতিথেয়তার ব্যাপারে জবাবহীন। তার চেহারা দেখে একটা জিনিস স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি দারুন বুদ্ধিমান একজন ব্যক্তি। এই ধরনের লোকেরা আলাদা একটি মুখোশ ব্যবহার করেন। অধিকাংশ মানুষই এই মুখোশ কে আসল রূপ ভেবে ধোঁকা খায়।

রাতে বাসায় ফিরতে রাত হয়ে গেলো। দড়জা খুলে আঁবু তার চিরচারিত হাসি দিয়ে বললেন,”হ্যালো মাই লিটল ইয়াংম্যান, এভরিথিং ইজ ওকে?” বাবার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে বললাম,”আঁবু আমি আর ছোট নেই, তুমি দিনে দিনে ছোট হয়ে যাচ্ছ।” আঁবু হাসতে হাসতে বললেন,”তাই হয়ত, যাও ফ্রেস হয়ে টেবিলে এসো, খাওয়া দাওয়া শেষে আমরা দুজনে বারান্দায় আড্ডা দেব আজ।” বাবা সবসময় এমন হাসিখুশি থাকেন। ছোট বেলা থেকে কখনো তাকে রাগ করতে কিংবা গোমরা মুখে দেখেছি কি না মনে পরে না। ব্যবসার ব্যাপারে তিনি কখনো বাড়িতে এসে কথা বলেন না। বাবার বারান্দায় আড্ডা দেয়ার অর্থ হচ্ছে ফ্রি ভাবে আমার সম্পর্কে জানতে চাওয়া।

খাওয়া শেষে বারান্দায় ঢুকে দেখলাম আঁবু একটা চেয়ারে বসে হা করে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে ঐটা চাঁদ নয় যেন একটা রসগোল্লা, এঁফুনি তিনি টপ করে গিলে ফেলবেন আর পৃথিবী অন্ধকার

মুঠো ডরা বোদ

হয়ে যাবে। আমি আবুর পাশের চেয়ারে ঘেয়ে বসলাম। আমিও আবুর মত  
হা করে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আবু হো হো করে হেসে ফেললেন।

ছোট বেলা থেকেই এই কাজটা আমি করি, আবু যদি অন্যমনস্ক হয়ে  
কোনদিকে তাকিয়ে থাকেন তাহলে আমিও তার পাশে সেইরকম করে  
তাকিয়ে থাকি। একসময় দুজনই হেসে ফেলি। আবু আমার দিকে না  
তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “তারপরে? তোমার তো ফাইনাল চলে এসেছে।  
ভার্সিটির শেষে কি করবে কিছু ভেবেছ?”

“হুম কিছুটা, বর্তমানে চাকরি বাকরি তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। ভাবছি  
তোমার ব্যাবসাটা দেখাশোনা করবো।”

“তুমি কি আমাকে খুশি করার জন্য একথা বলছো?”

“হ্যাঁ বাবা, তুমি ধরে ফেলেছ”

“তুমি যা খুশি করতে পারো, আমি তোমাকে কোন চাপ দেব না।”

“আমি নিজ থেকে কিছু শুরু করতে চাই, ভাবছি টেকনোলজি সাইটে কিছু  
করবো”

“আমিও তোমার মতই ছিলাম, বাবা দরিদ্র ছিলেন বলে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত  
পড়েছি। তারপরে এখন নিজ চেষ্টায় এই ব্যাবসা দাঁড় করিয়েছি। আমি ছোট  
একটি দোকান ভাড়া নিয়ে গাড়ির চাকা বিক্রি শুরু করেছি। সেখান থেকে  
আজ ঢাকা শহরে তিনটা শো রুমের মালিক। মধ্যবিত্ত হলেও আমি তোমাকে  
সব কিছু দিয়েছি যেসব আমি ডিজারভ করতাম তোমার বয়সে থাকতে। তুমি  
নিজে কিছু করতে চাইলে সেই পথ খোলা আছে, আর যেকোন হেল্প এর  
ব্যাপারে আমি আছি তোমার সাথে।”

“আমি জানি আবু, তোমার কি মনে পরে তুমি কখনো কোন ব্যাপারে  
আমাকে “না” শব্দটা বলেছ?”

আবারো দুজনে শব্দ করে হেসে ফেললাম। আমার আন্মাজান ঘাসফড়িং এর  
মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে দড়জার পেছন থেকে আমাদের কথা শুনছিলেন। বিরক্তি  
নিয়ে বারান্দায় ঢুকলেন যেন জরুরী কিছু খুঁজছিলেন। তারপরে আবার  
বেরিয়ে যেতে চললেন। আমি বললাম, “আম্মা এসো আজ তিনজনে বসে

মুঠো ডরা বোদ



জোছনা দেখি, আবু আজ হা করে আর একটু হলে চাঁদটা খেয়ে ফেলতেন।  
আমাদের আর জ্যোৎস্না দেখা হতো না ” আন্মা এই সুযোগের জন্যই  
অপেক্ষা করছিলেন। তিনি হাসি মুখে এসে পাশে বসলেন। আজ রাতটা  
আমরা জোছনা দেখব, শব্দহীন জোছনা।

দুই বছরে এই প্রথম নীনার ফোন কিংবা মেসেজ না পেয়েই ঘুম ভাঙলো।  
ব্যাপারটা আসলেই অদ্ভুত। যত কিছুই হোক ও আমাকে ফোন করবেই।  
ভাবলাম ভার্শিটিতে যেয়ে ওকে ব্যাপারটা বলবো। নীনা আজ ভার্শিটিতে  
আসেনি। সন্ধ্যায় আনন্দের বাসায় গিয়েছিলাম। আনন্দ আমার সবথেকে  
ভালো বন্ধু, দুই বছর আগে রোড একসিডেন্টে মারা গেছে। মাঝে মাঝে  
ওদের বাড়িতে যাওয়া হয় সেজন্যই। ওর মা রাধাদেবী আমার দিকে তাকিয়ে  
থাকেন আর টপটপ করে চোখের জল ফেলেন। আনন্দের বাবা আমার গায়ে  
হাত বুলিয়ে নিজের ছেলেকে ভেবে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন। এই  
বাড়িতে আসলে আমাদের তিনজনের চোখের জলে বাতাসের আদ্রতা বেড়ে  
যায়। আশেপাশে মেঘ থাকলে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হতে পারতো।

রিকশায় উঠে মোবাইল বের করে ফোন দিলাম নীনাকে। আজকের ব্যাপারটা  
নিয়ে আমার মাঝে বেশ কৌতহল জন্মেছে। প্রথম বার রিং হয়েছে কিন্তু কেউ  
ফোন ধরেনি। দ্বিতীয়বার একটি ছোট মেয়ে ফোন ধরলো। আমি জানি নীনা  
ইচ্ছে করেই ওর ভাগনী আফরিন কে দিয়ে লাউডস্পিকারে ফোন ধরিয়েছে,  
ও আশেপাশে কোথাও বসে আছে। আমি বললাম, “আফরিন নীনা কি  
তোমার পাশেই আছে?” আফরিন চুপ করে থেকে বললো, “আসলে আমি  
মিথ্যে বলতে পারি না, কিন্তু এখন একটা মিথ্যে কথা বলবো, নীনা আন্টি  
বাসায় নেই।”

“আচ্ছা তাহলে আমি ফোন রেখে দেই”

“ফোন রাখবি কেন গাধা? কেন ফোন করেছিস?” নীনা ফোন ধরেছে।

মুঠো ডরা বোদ

“নাহ, আজ সারাদিনে তুই ফোন করিসনি, তাই ভাবলাম শরীর খারাপ হয়তা।”

“নাহ সব ঠিক আছে, শোন আমি ঠিক করেছি তোকে আর কখনো ফোন করবো না। আমার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আগামী মাসে ছেলে বাইরে থেকে এসে এঙ্গেজ করবে। এখন পর পুরুষের সাথে কথা বলা আমার মানায় না, তুই বুঝতে পারছিস গাধা? তাই আমি ঠিক করেছি আর কোন দিন তোকে ফোন করবো না।”

“হুম বুঝতে পারছি, অন্তত তোর জ্বালা থেকে বাঁচলাম। তুই কি আর ক্লাস করবি না?”

“বুঝতে পারছি না, আমার হাজবেভ যদি পারমিশন দেয় তাহলে ফাইনাল দেব, নইলে দেব না। তুই এত দুশ্চিন্তা করছিস কেন? আমার প্রতি কি দুর্বল হয়েছিস? শোন এখন আর টাইম নেই। তুই দুর্বল হলেও আর লাভ নেই, আমার বাবাকে তো চিনিস। সে যখন বলেছে তো সেটাই করবে, সুতরাং তোর আর চাঙ্গ নেই।”

“খুব ভালো ইনফরমেশন দিলি, আমাকে উদ্ধার করলি। এখন রাখলাম।”

“আরে শোন, ছেলে কি করেছে জানিস? আমার জন্য অলরেডি একটা ডায়মন্ড রিং পাঠিয়েছে। তুই দেখলে পাগোল হয়ে যাবি। আর একটা টেডি বেরার পাঠিয়েছে, আচ্ছা আমি কি বাচ্চা? আর শোন.....”

ফোন কেটে দিলাম। সারা রাতেও ওর বকবকানি শেষ হবে না। মেয়েরা নাটকীয়তা খুব ভালো জানে। দেখা যাবে কাল সকালেই আবার ফোন করে বকবকানি শুরু করে দেবে। যেখানে বড় বড় মনিষীরা নারীর মন বুঝতে পারেনি সেখানে আমি কিভাবে বুঝব?

(৪)

নীনা মিথ্যে বলেনি। সত্যিই ওর এঙ্গেজমেন্ট হয়ে গেছে। আমাকে ফোন করে এটেন্ড করতে বলেছিল। ইচ্ছে করছিল না তাই আর যাওয়া হয়নি। কিছুদিন পরে ভার্শিটিতে এসেছিল আমার সাথে দেখা করতে। বিয়ের কার্ড হাতে দিয়ে

মুঠো ডরা বোদ



ছল ছল চোখে বলেছিল,”তুই আসবি কিন্তু।” আমি শুধুই হেসেছিলাম।  
শেষটায় চোখের জল আর রাখতে পারেনি। কাঁদতে কাঁদতে বললো,”নিজের  
খেয়াল রাখবি”

“হুম”

“ঠিক ভাবে থাকবি”

“হুম”

“হুম হুম করছিস কেন গাধার বাচ্চা? এখন তো আর আমি থাকবো না।  
তোকে কে দেখে রাখবে? নিজে যেটা ভালো বুঝিস সেটা করবি না, একটু  
ভেবে কাজ করবি। আর শোন, আমি তোকে আর কখনো ফোন করবো না।  
যেদিন আমার প্রথম সন্তান হবে সেদিন তোকে ফোন করবো। সেদিন কিন্তু  
তোকে আসতে হবে। আর শোন আমার ছেলে হলে তোর নামে নাম রাখব  
‘রিক’, আর মেয়ে হলে ‘মিমি’, আর তোর মেয়ের সাথে আমার ছেলের বিয়ে  
দেব”

“অসম্ভব, তাহলে আমার মেয়ের প্রবলেম হবে, বাবার নাম আর জামাইয়ের  
নাম এক হয়ে যাবে।”

“চুপ কর গাধা, এমন ইমোশনাল মুহূর্তে তুই আমাকে হাসাতে চেষ্টা  
করছিস?”

“হুম”

“চল আমার হবু বরের সাথে তোকে পরিচয় করিয়ে দেই”

নীনার হবু বর ইশতিয়াক আহমেদ ভীষণ স্মার্ট। নীনার সাথে দারুন ম্যাচ  
করেছে। ইংল্যান্ডের হাডারসফিল্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন শেষ  
করে এখন দেশে বাবার ব্যবসা দেখছেন। চমৎকার মিশুক একজন মানুষ।  
যাওয়ার সময় নীনার হবু বরকে বললাম,”আমার এই বন্ধুটা একদম পাগলী,  
কিন্তু ও দারুন ভালোবাসতে জানে। আমার প্রিয় এই বন্ধুটিকে কখনো কষ্ট  
দিবেন না প্লিজ। উইশ ইউ বোথ এ হ্যাপি লাইফ।”

মুঠো ডরা বোদ

নীনা হয়ত আর যন্ত্রনা করবে না। আমাকে আর বিরক্ত করবে না। আবার এমনো হতে পারে ফোন করে বলবে,”শোন গাধার বাচ্চা, আমার ছেলে তোকে দেখতে চাচ্ছে, এশুনি চলে আয়। ওকে নিয়ে ইডেন কিংবা ভিকারুনিসার সামনে থেকে ঘুরে আয়। আমার ছেলে আবার মেয়েদের দেখলে লজ্জায় ঠান্ডা হয়ে যায়, একদম তোর মত স্বভাব।“

বাবার একটা মাইনর এট্যাক হয়েছে। অধিকাংশ সময় বাসায় রেস্ট থাকতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে বলে তোমার শরীর খারাপ হচ্ছে কেন? আমি শুধুই হাসি, বাবাও হাসে আমার সাথে। কিছুক্ষন আব্বুকে ধরে শুয়ে থাকি। আব্বুর গায়ের গন্ধটা ছোটবেলা থেকেই বিমোহিত করে। হয়ত কিছুদিন পরে এই গন্ধটা হারিয়ে যাবে। তাই যতটুক পারি আব্বুর কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করি।

মিমির বাবা মিমির বিয়ে ঠিক করেছেন তার সেই হায়দার চাচার ছেলের সাথে। বাবার কথার বাইরে যাওয়া তার জন্যে কখনই সম্ভব নয়। মিমি তার বাবার কাছে আমার জন্যে সুপারিশ করেছে সেটাও আমি জানি। কিন্তু ভদ্রলোক হয়ত আমাকে পছন্দ করেননি।

মিমি এসেছে শেষ বারের মত আমার সাথে দেখা করতে। দু’চোখের নীচে কালো দাগ পরেছে। হয়ত নির্ঘুম সারারাত জেগে থাকে। ওর চোখ ফুলে আছে। হয়ত অনেক কেঁদেছে। আমি সামনে ঝুঁকে বললাম মিমি কবিতা শুনবে? মিমি অবুঝ শিশুর মত মাথা নেড়ে সাই দিল, আমি শুরু করলাম জীবনানন্দের “তুমি কেন বহুদূরে”

“তুমি কেন বহু দূরে\_ঢের দূরে\_আরও দূরে, নক্ষত্রের অস্পষ্ট আকাশ

মুঠো ডরা বোদ



তুমি কেন কোনদিন পৃথিবীর ভিড়ে এসে বলো নাকো একটিও কথা  
আমরা মিনার গড়ি\_ভেঙ্গে পড়ে দুদিনেই\_স্বপনের ডানা ছিড়ে ব্যাথা  
রক্ত হয়ে ঝরে শুধু এইখানে\_ক্ষুধা হয়ে ব্যাথা দেয়\_নীল নাভিস্বাস;

মিমি মাছের মত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কবিতা শুনছিল। আমি বললাম ,”মিমি  
রাত হয়েছে, বাসায় যাবে না?”

“আর কিছুক্ষন তোমার পাশে বসে থাকবো”

“বৃষ্টি নামবে মিমি”

“আমি কি তোমাকে কিছুক্ষন জড়িয়ে ধরে রাখবো?”

“আজ আকাশেরও মন ভালো নেই”

মিমি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। ওর চোখের কাজল মাখা জলে দাগ  
ফেলে যাচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বুঝ বৃষ্টি। আজ মেঘও কেঁদে যাবে অবিরত ।  
পথিকেরা শব্দ ছায়ার খোঁজে ছুটে যাচ্ছে। গাছেরা শির উঁচু করে বৃষ্টিবিলাসে  
মত্ত। বৃষ্টিতে ভিজছে ছোট একটি মেয়ে। পৃথিবীর বিষাদ তাকে ক্লিষ্ট করেনা।  
বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে। ডালের উপরে সারি হয়ে বসে আছে কাকের দল।  
মিমি এখনো কাঁদছে।

হাফিজুর রহমান রিক (রিয়েল ডেমন)

ই-মেইলঃ realsrv@yahoo.com

মুঠো ডরা বোদ

## শিরোনামহীন

যখন আমার পথের শেষে পথ থাকে নি  
কোন অধিকারে ডাকছো আমায়!  
যখন আমি পথের ধূলোয় লুটিয়ে ছিলাম,  
কেউ আসো নি হাত বাড়িয়ে!  
উড়ছে যখন শতক রাতের হাজার প্রহর ভাবনাগুলো সঙ্গীবিহীন,  
কেউ আসো নি!  
পুড়ছে যখন বিষাদপাখি, ভগ্ন ডানায়,  
কেউ আসো নি শুভ্র ডানায় একটু আদর ছুঁয়ে দিতে।  
অন্ধকারের একলা ঘরে বন্দী যখন,  
কেউ আসো নি প্রদীপ হাতে।

আজকে যখন শীতপাখালি তাড়িয়ে বেড়ায়,  
কেন তবে আমায় ডাকো?  
ঝড়ের মাঝে শেকলপায়ে আটকে গেছো পাথর খাঁজে,  
এখন কেন আমায় খোঁজো!

কেউ আসে নি,  
কেউ আসে না,  
পথের শেষে পথ দেখাতে!

দূরদ্বীপবাসিনী

ই মেইলঃ-krishnochura.r@gmail.com

# মুঠো ডরা বোদ



## পুল ক্লাব

প্রতিদিন ঠিক সাড়ে পাচটার সময় ছেলেটাকে ক্লাবে ঢুকতে দেখে দোলা। এসেই ফুড কাউন্টার থেকে একটা কফি নেয়। তারপর পকেট থেকে একটা সিগারেটের কেইস বের করে খুব স্টাইল করে একটা সিগারেট ঠোটে নেয়। প্রখর ব্যক্তিত্বের সাথে সিগারেটটা জ্বালিয়ে তিন নাম্বার টেবিলটাতে জয়েন করে। চারজন বন্ধু মিলে প্রায় তিন ঘন্টা এইট বল খেলতে থাকে। ছেলেটাকে হয়তোবা দোলা তেমন একটা খেয়াল করতেনা যদিনা ছেলেটার একটা অদ্ভুত অভ্যাস থাকতো। সে প্রায় প্রতিদিনই তার সিগারেটের কেইসটা টি টেবিলে ফেলে চলে যায়। তারপর দশ মিনিট পর হস্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। কেইসটা নিয়ে একটা আত্মতৃপ্তির হাসি দেয়। তারপর চলে যায়।

দোলা একদিন পাশ থেকে বলে উঠেছিলো, “প্রতিদিন আপনি একই ভুল কিভাবে করেন?”।

ঠান্ডা চোখে ছেলেটা বলেছিল, “নান অফ ইউর বিজনেস। অয়েল ইউর অওন মেশিন।”

প্রচন্ড আহত হয়েছিলো দোলা। সে দেখতে যথেষ্ট সুন্দরী আর স্মার্ট হওয়ায় সব সময় ছেলেরা খুব তোয়াজ করে কথা বলে। জীবনে এই প্রথমবার কোন ছেলে তার সাথে এমন বিহেইভ করলো। স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়েছিলো শুধু। কোন কথা বেরোয়নি মুখ থেকে। বলতে খুব ইচ্ছে করছিলো, “বেটা বলদ, হাবলা কোথাকার। শর্ট মেমোরী। আমার মেশিনের কি বুঝবি? তোর নিজেরই তো মেশিনের ঠিক নেই।” কিন্তু রাগে থমথম করা মুখটা থেকে একটা শব্দও বের করতে পারলোনা দোলা। মুচকি একটা হাসি দিয়ে ছেলেটা চলে গেলো পাশ কাটিয়ে। রাগে জ্বলতে লাগলো দোলা। চোখ সরিয়ে নিয়ে বোর্ডের দিকে মন দিলো। রাগটা ঝেড়ে ফেললো কিউ বলের উপর।

রাতে ঠিকমত ঘুম হয়নি দোলার। মন মেজাজ প্রচন্ড খারাপ। অদ্ভুত এই ছেলেটার কথা চিন্তা করলেই রাগে মাথার টেম্পারেচার বেড়ে যায়। সে বাসা থেকে ঠিক করে এসেছে আজ ছেলেটাকে আচ্ছামত ধোলাই দেবে। সাপের পাচ পা দেখেছে নাকি অসভ্য ছেলেটা। কিন্তু সাতটা বেজে গেলেও আজ ছেলেটা আসেনি।

মুঠো ডরা বোদ

মেজাজটা খিচড়ে গেল আরো। রাতে ঘুমোতে গিয়েও বারবার ছেলেটার কথা মনে পড়ছে। এটাই আরো ঝামেলা বাড়িয়ে দিচ্ছে। রাগ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। রাগ কমাটা খারাপ লক্ষণ। ঝাড়ি মারার ইচ্ছাটা মরে যেতে পারে। পরের দিন অবশ্যই দোলা ছেলেটাকে পাকড়াও করবে। আচ্ছামত রামধোলাই দেবে। নাকমুখ শক্ত করে আইপড়ে হার্ডরক গান ছেড়ে কানে ইয়ারফোন গুজে ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগলো দোলা। হার্ডরক গান শুনলে মন শক্ত হয়। রাগ বেড়ে যায়। এই মুহুর্তে রাগ বাড়ানো দরকার। ফাজিল ছেলে। বিহেভিয়ার জানে না।

পর দিন চারটায় গিয়ে দেখে ছেলেটা রুটিন ব্রেক করে তার আগেই চলে এসেছে। ঠোটে সিগারেট লাগিয়ে খেলায় মত্ত। কানে আবার ইয়ারফোন লাগালো দোলা। রাগটা জমানো দরকার। দশ মিনিট গান শুনে যুদ্ধাংদেহী ভাব নিয়ে ছেলেটার পেছন গিয়ে দাড়ালো দোলা। কর্কশ গলায় বলে উঠলো, “এক্সকিউজ মি, শুনছেন?”

- উফফ!! হু দ্যা হেল? এত বাজে গলার টোন?

পেছন ফিরে তাকালো অর্ণব।

- ও আচ্ছা। আপনি? দ্যা মেশিন উইম্যান? কি সমস্যা?

- আপনি কি বললেন? আমার গলার টোন বাজে? স্যরি বলুন।

- হাহ, সরি বলবো মানে? বাজে জিনিসকে বাজে বললাম। স্যরি বলবো কেনো?

- শুনুন, আপনি কিন্তু কোন কারণ ছাড়া আমার সাথে সেদিন থেকে বাজে ব্যবহার করে যাচ্ছেন। আমি কিচ্ছু বলিনি।

- তো এখন কি করছেন?

- আপনি সেদিন শুধু শুধু আমার সাথে বাজে ব্যবহার করেছেন। আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

- আমি কাউকে স্যরি বলিনা। আপনাকেও বলবোনা। আমার তো কোন ফল্ট নেই। আপনিই আমার ব্যাপারে নাক গলিয়েছেন।

- তাই বলে আপনি যাচ্ছে তাই বলে যাবেন তা তো হবেনা। স্যরি বলুন, তা না হলে কিন্তু...

- এক শর্তে স্যরি বলতে পারি। আমার সাথে বাজী খেলতে হবে। যদি হারাতে পারেন তাহলে স্যরি বলবো। আর আপনি হারলে আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিতে হবে।

মুঠো ডরা বোদ



- রাবিশ। এক ঘণ্টা সময় মানে। ইউ চিপ।
- না না। আপনার অন্য কিছু ভাবার দরকার নেই। আপনাকে নিয়ে এসব চিন্তা আমার সাতজন্মেও কেউ করবেনা। আপনি আমাকে কফি খাওয়াবেন।
- লজ্জায় লাল হয়ে দোলা বললো “ওকে, কি খেলবেন?”
- লেডিস চয়েজ। আপনি যা বলবেন তাই।
- না, আপনি রাজী লেগেছেন। আপনি যা বলবেন তাই। আর আমি লেডি মানেই যে দুর্বল সেটা ভাবার কোন কারণ নেই।
- আচ্ছা, এইট বল। রেইস টু ফোর।
- ওকে ডান।

হেরে গেলো দোলা। ৪-৩ এ। শেষ ম্যাচে অর্ণবের দুর্দান্ত খেলা তাকিয়ে দেখা ছাড়া উপায় ছিলো না ওর। অর্ণব বললো, “চলুন, কফি খাওয়াবেন।” দোলা বয়কে ডাকতে গেলেই অর্ণব বলে উঠলো, “এখানে না। বাইরে কোথাও। আপনার সাথে রিকশায় করে কোন কফিশপে খাব।”

- ননসেন্স। আপনি এ কথা আগে বলেন নি। আপনার সাথে আমি রিকশায় উঠবো না। এটা কন্ডিশনের বাইরে।
  - নোপ। আপনি আমাকে একঘণ্টা সময় দিতে রাজী হয়েছেন। চলুন, আমার চরিত্র ভালো। এটুকু বিশ্বাস রাখতে পারেন।
- ইতস্তত করে দোলা রাজী হয়ে গেলো।

পরের বেশ কয়রাতেও ঘুম হলোনা। এই ফালতু ছেলেটা বড় যন্ত্রণা দিলো। কিন্তু তবুও এর মধ্যে কি যেন একটা রহস্য আছে। রিকশায়, কফিশপে অনেকবার হাসিয়েছে মজার মজার কথা বলে। বেশ মজা করতে জানে। কিন্তু মাঝেমাঝে এত রাফ ব্যবহার যে কেন করে? উফফ, ছেলেটার নামটা পর্যন্ত জানা হয়নি।

এ নিয়ে টানা পাচদিন দোলা রাজী খেলেছে অর্ণবের সাথে। একদিন জিতেছে । সেদিনও দোলার ইচ্ছাতেই কফি খেতে গিয়েছিলো দুজনে। ইদানীং যন্ত্রণাটা কেন যেন বেড়ে গিয়েছে। সারাদিন ছেলেটার কথা মনে পড়ে। এত রহস্য কেন ছেলেটার মধ্যে। কথা বলতে চমৎকার লাগে। সঙ্গটা বেশ উপভোগ করে। অর্ণবও বেশ উপভোগ করে তার সঙ্গ , বুঝতে পারে দোলা । কিন্তু মাঝে মাঝে বাজে ব্যবহার করেই চলে। দোলা মেনে নিয়েছে। ছেলেটা একটু পাগল টাইপের। হতেই পারে।

মুঠো ডরা বোদ

ব্যাপারটা ভাবায় তাকে। কি সম্পর্ক তাদের মাঝে? এত সহজে কি বন্ধু হওয়া যায়? তাহলে কেন এত ভাল লাগছে ছেলেটাকে এই অল্প কদিনের পরিচয়ে। সন্দেহ, দ্বিধা-দ্বন্দ।

আজ পহেলা ফাল্গুন। দোলা আর অর্ণব খেলা শেষে আবার রিকশায়। আজ দুজনই অনেক নীরব। হঠাৎ নীরবতা ভাঙে অর্ণব।

- আচ্ছা, সেদিন আমি স্যরি বলতে রাজী না হলে করতেন?
- অনেক কিছুই করতাম।
- মারতেন নাকি? মহিলা গুলো নাকি আপনি? নাকি আপনার বয়ফ্রেন্ড গুলো?
- শাট আপ। আমার চলার জন্য কোন বয়ফ্রেন্ড লাগেনা।
- ও আচ্ছা তাই। অবশ্য আপনার যেই চেহারা....
- আপনার সমস্যাটা কি? ভাল না লাগলে নেমে যান রিকশা থেকে। আমি কি জোর করে এনেছি আপনাকে?

চুপ করে যায় অর্ণব। দোলা মজা পায়। অবশ্য একটু মন খারাপও হয়। তাকে আজ পর্যন্ত কেউ অসুন্দর বলেনি। ছেলেটার প্রবলেম কি?

পাঁচ মিনিট পর আবার নীরবতা ভাঙে অর্ণব।

- শুনছো পাগলী?
- আজব, আপনি তুমি করে কথা বলছেন কেন? পাগলী মিনস হোয়াট? রাবিশ, ইডিয়ট কোথাকার। আপনি নামুন রিকশা থেকে। এই, রিকশা থামাও।
- অর্ণব রিকশাওয়ালার পিঠে হাত দিয়ে ইশারা করে রিকশা না থামাতে। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে ভারী কণ্ঠে বলতে শুরু করে,
- আজ সব কথা আমি বলবো। তুমি শুনবে । কথা বলার সুযোগ পাবে যদি মেনে নাও একটা শর্ত। একটাই শর্ত দেবো তোমাকে। আর কখনো কোন দাবী নিয়ে আসবো না তোমার হৃদয় মহলে। হারিয়ে দিয়েছো আমায়। আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে এক রাস্তার পাশে । এই দিনে আমার আমিকে তোমার করে নিয়েছিলে। অনেক খুজেছি তোমায়। কোথাও পাইনি। এত বড় শহরের এক ছোট পুল ক্লাবে খুজে পেলাম অবশেষে । কিছু করার ছিলোনার আমার। বিশ্বাস করো । এমনি এমনি তো আর আমাকে চোখে পড়বেনা তোমার। সে জন্যে আমার অল্প একটু ছলনা কি ক্ষমা করে দেয়া যায় না? জানি তুমি অনেক শক্ত। চলার পথে কারো প্রয়োজন হয়না । কিন্তু আমাকে তাকিয়ে দেখো। আমি একলা চলতে

মুঠো ডরা বোদ



পারিনা। হারিয়ে যাই। যেমনটা হারিয়ে গেছি তোমার মাঝে। একটা খুঁটি দরকার আমার। আকাশে যখন মেঘের ঘনঘটা, তখন আমার বুক কেপে উঠে। আমার একটু সাহস দরকার। বৃষ্টির স্পর্শ আমি অনুভব করতে চাই। আমার একটা হাত দরকার। যে হাতটা ধরে আমি বৃষ্টিতে ভিজবো। বর্ষার প্রথম কদমফুলটা দুইটুকী করে সেই হাতে তুলে দেবো। যে হাত ধরে বাদলা রাতে ব্যাঙের ডাক শুনবো। অজানা আতঙ্কে সেই হাতটা কেপে উঠলে আমি সাহস দেবো। প্রতিজ্ঞা করবো পাশে থাকার। যেই হাতের ছোয়া আমি সারাটা জীবন আমার হাতে পেতে চাই। প্রতিটা মুহূর্তে। রূপিন্ডের স্পন্দন আমায় ছেড়ে গেলেও সেই হাত আমায় ছাড়বেনা। এমন একটা হাত দরকার আমার। তোমার হাতটা কি রাজী আছে আমার সঙ্গী হতে?

ডান হাতটা পেতে ধরলো অর্ণব দোলার সামনে। মাথা নামিয়ে তাকালো দোলার দিকে। কিছুটা আনন্দে, কিছুটা বিস্ময়ে- আবেগে দোলার চোখ দিয়ে একফোটা জল বের হয়ে এলো।

রিকশাওয়ালা পিছন ফিরে বিস্মী একটা হাসি দিয়ে বললো, “হাতটা ধইরা ফেলান আফা। নাইলে হারাইয়া যাইবো।”

সুদীপ্ত কর

ই-মেইল : cryptexcode@gmail.com

মুঠো ডরা বোদ

## বৃষ্টি পরবর্তী নিমগ্নতা

অষ্টপ্রহর প্রেমহীন নগরের মেঘমালারা জমাট বাঁধে কুয়াশার মেঘলুপ্ত  
ধোঁয়াশায়। অনির্বাণ বৃষ্টি পতনের কালজয়ী সময়ের গায়ে পঙ্কিলতার  
মেঘাবরনে যে সকল যৌথ প্রত্যাখ্যান জোছনা রাতে দিকভ্রান্ত উচ্ছিষ্ট  
ভালোবাসার ইতিহাস লিখতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় , আমিও জেনেছি সে  
সকল উচ্ছিষ্ট ভালোবাসার শেষ শীতে কুয়াশায় নিমগ্ন হবার সংবাদ। ক্রমশ  
আড়াল হতে থাকা মানুষগুলোর মাঝে চাঞ্চল্য বেড়ে গিয়ে করমর্দনের  
সুপ্রাচীন আন্তরিকতায় বিভেদের দেয়াল তুলে দেয় বিচিত্র হস্তরেখা । হাত  
মুছে হাত ডুবায় ক্ষারীয় জলে। জল ফিরে যায় মেঘের কাছে। বিচিত্র  
হস্তরেখার স্পর্শ নিয়ে নিমগ্নতা বাড়ায় মেঘ। বৃষ্টি পরবর্তী নিমগ্নতা রাজত্ব  
করে কুয়াশার বুকে। মানুষ নতুন করে আড়াল না হয়ে জমে থাকা বরফের  
মতো কাছে আসে উষ্ণতায় গলে গলে অশ্রু হবার চিরাচরিত নিমজ্জনে র  
আনন্দে।

নীরব ০০৭

ই-মেইলঃ gupta15.sust@gmail.com

মুঠো ডরা বোদ



সমাপ্ত

\*\*\*

জীবন মেতে উঠুক ভালবাসার স্পর্শে

মুঠো ডরা বোদ